২৩৭

সাক্ষরতা বুলেটিন

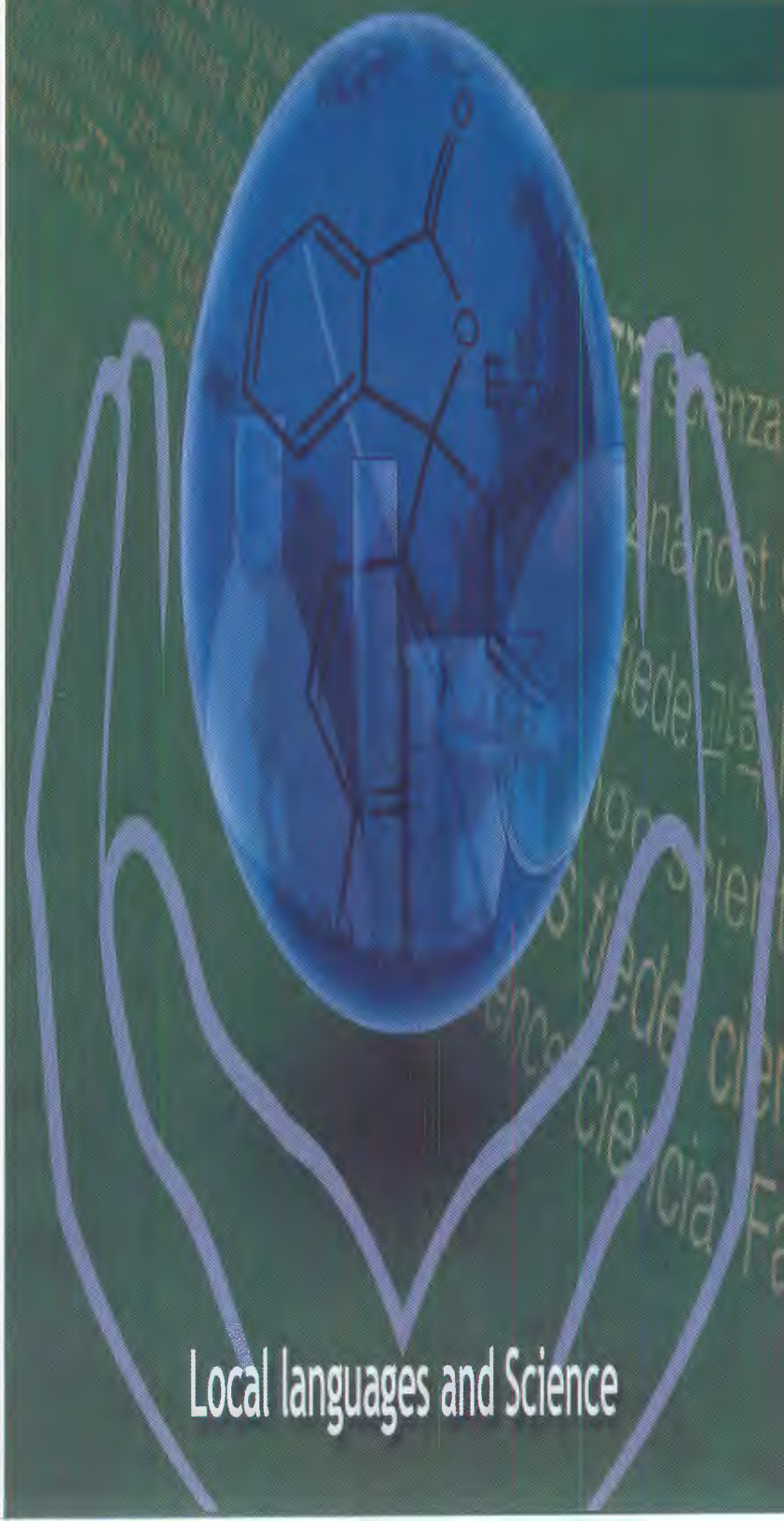

ফাল্গুন ১৪২০
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৩৭ ফাল্গুন ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সূচিপত্র

৩ **শফি আহমেদ**
…আমি কি ভুলিতে পারি…

৭ **শফিউল আলম**
একুশে ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

৯ **ড. এ কে এম খায়রুল আলম**
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান

১৮ **তপন কুমার দাশ**
সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন:
কে শত্রু কে মিত্র?

২১ **মো. আব্দুল আজিজ মুন্সী**
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা

২৪ **মোহাম্মদ হারুন মিয়া**
বইও পরিবর্তন আনতে পারে

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি আ হ মে দ

...আমি কি ভুলিতে পারি...

একুশে ফেব্রুয়ারি। সারা বছরের অন্যান্য দিনগুলির মধ্যে আলাদা একটা দিন। এমন একটা দিন যার স্বতন্ত্র মহিমা আছে। অবিস্মরণীয় এই একটি দিন স্মৃতির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের নিয়ে যায় সেই উনিশ শ' বায়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে, তার আগের আরো চার বছরের ব্যাপ্তিতে। আবার তার পরের কয়েক বছরেও। প্রথম কয়েক বছর পাকিস্তানী শাসকবর্গের বেশ জুলুমদারি নিষেধাজ্ঞা ছিল এই দিনটি পালনের ক্ষেত্রে। অতএব সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তত্ত্বের প্রায় অনিবার্য অনুসরণে আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরাও ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই পরবর্তী কালেও একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যে একটা বাক্ প্রয়োগ, -অমর একুশে, -কে এতটা জনপ্রিয় ও বহুলব্যবহৃত এবং অমৃত অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এই শব্দযুগলের মধ্যে একটা চিরকালীন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সুনিশ্চিত করেছি, তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে হয়ত আমাদের যতটা গভীর আবেগ ছিল, ততটা স্থিরপ্রত্যয়ী চেতনা ছিল না। কিন্তু 'অমর একুশে' যূথবদ্ধ শব্দ হিসেবে যেন ঈদ মোবারক, শুভ বিজয়া অথবা মেরি ক্রিসমাসের মতই ব্যাপক গণভিত্তি অর্জন করেছে, অবশ্য শুধুই সংখ্যাগত দিক থেকে হয়ত তিন ধর্মের সর্বমোট বিশ্বাসীদের কাছে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা হার মানতে পারি।

একুশেকে অমরত্বে ভূষিত করার মধ্যে অবশ্যই আবেগ আছে, অহংকার আছে, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' উচ্চারণের মত দুর্বিনয় ঔদ্ধত্য না থাকলেও তার মাহাত্ম্যটা আছে, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের একটা অদম্য ইচ্ছা আবশ্যিকভাবেই এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এবং এই কথাটা তো অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পর্ববিভাগ বা উপাদান কালের যাত্রায় হীনমূল্য, ক্ষয়িষ্ণু, নড়বড়ে এমনকি বিস্মৃত হয়ে গেলেও কোন জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রধান মাইলফলকসমূহ সবসময়ই অক্ষত থাকে। তাত্ত্বিকতার সেই ভিত্তি থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জন্য, বাঙালির জন্য, বাংলাভাষাভাষীদের জন্য সত্যিই অমর। অমর শব্দটির মধ্যে যে ব্যুৎপত্তিগত দ্যোতনা আছে, সেই 'চিরস্থায়ী' চরিত্রটার কথা একটু পাশে সরিয়ে রেখে দিলেও বিগত ছয় দশকেরও অধিক কাল ধরে আমাদের সমাজ ও রাজনীতির সকল আন্দোলনে ও বাঁকে একক ঘটনা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি যে এক অনিঃশেষ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে, এমন বাস্তবতাকে তো কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না।

একটা তাত্ত্বিক বিষয় আমার মাথার মধ্যে প্রায়শই ঘুরপাক খায়। আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির বস্তুগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'ভাষা আন্দোলন' শব্দযুগলকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকি। এটাকে পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষীদের 'ভাষা বা সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করি না। একুশে যে কারণে বিতর্কাতীতভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে অমরত্ব দাবি করতে পারে, সেই যুক্তির সম্প্রসারণ ঘটাতেই তো আমরা বর্ষপরিক্রমার একটা রৈখিক ছক তৈরি করে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একটা ঊর্ধমুখী গতিপথ চিহ্নিত করে থাকি। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর অতিরিক্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এমন সব নৈতিক অথবা আদর্শিক বিষয় তো সমাজবৈজ্ঞানিক দিক থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এমন সব প্রায়-অবিভাজ্য উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকার পরও আমরা বায়ান্নোর ওই ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি, যার সূত্রপাত ঘটেছিল আরো কয়েক বছর আগেই এবং যার শেকড়টার সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্বের 'ক্ষমতার' বিষয়টি অনিবার্যভাবেই যুক্ত ছিল, সেটাকে ভাষা আন্দোলন অথবা কখনো ভাষা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছি, ভাষা বা সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ হিসেবে বিচার করতে চাইনি।

তিতুমীরের ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ সংগঠিত করার প্রচণ্ড প্রবল উপনিবেশবিরোধী তৎপরতার মধ্যে যতটা আবেগ ও আন্তরিকতা ছিল, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও শক্তির সমাহার ততটা ছিল না। তিতুমীরের ওই ব্রিটিশবিরোধী কার্যক্রমকে আমরা কিন্তু 'বিদ্রোহ' বলেই চিহ্নিত করি। আবার

রাজশাহীর নাচোলে ইলা মিত্রের সাহসিক নেতৃত্বে বর্গাচাষীদের যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, যেখানে কৃষক, ভূমিহীন মানুষ রক্ত দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল, সেটাকেও আমরা 'বিদ্রোহ' বলে গণ্য করি। তিতুমীর না হয় একটি শক্তিমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সুতরাং শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ইতিহাস রচনার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাকে বিদ্রোহ বলার মধ্যে বিদ্রোহীর অবস্থানকে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা না করে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাজ-ব্যবস্থার শত্রু বলে গণ্য করা হল। যদিও তার মধ্যে উপনিবেশিক শাসককুল সমর্থিত ইতিহাস রচনার নীতিকেই গ্রহণীয় বিবেচনা করা হচ্ছে।

কিন্তু নাচোলের কৃষকরা যা করেছিলেন তা হল, তাদের ওপর সর্ব অর্থে যে সব অন্যায় ও অত্যাচার বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছিল এবং থেকে থেকেই বাড়ছিল, তা অবসানের জন্য সংগঠিত ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিবাদ। তিতুমীর ও নাচোল উভয়তই অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা প্রতিবাদকে আলাদা ভাষা ও মাত্রা দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলনকারীরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করেছিল। সাধারণ অর্থে অবশ্য ব্রিটিশ শাসক এবং নাচোল অথবা যে কোন অঞ্চলের জমিদার, –এরা সবাই-ই ক্ষমতা ও অত্যাচারের প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাস রচনার প্রচলিত এবং স্বীকৃত ধারায় তাই বুঝি তিতুমীর ও নাচোলকে 'বিদ্রোহ' বলছি, যার মাধ্যমে কিন্তু সনাতনী চিন্তার দিক থেকে বিদ্রোহের সঙ্গে 'অন্যায্যতার' যোগকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করার সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছি এবং আবার তার মাধ্যমেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনকে (যেমন বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন) বিদ্রোহের ধারণা থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করছি। এমন ধারণাকে চিহ্নায়ন বা সুনির্দিষ্ট সমীকরণের জন্য আমরা পৃথক শব্দ সৃজন করেছি এবং আন্দোলনের চরিত্রসাপেক্ষে অর্থবহভাবে তার ব্যবহার করে থাকি।

যেমন পঞ্চদশ শতকের নিখিল ইউরোপীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে 'নবজাগরণ' বলে সভ্যতার যাত্রায় পর্বভিত্তিক একটা ঐতিহাসিক চিহ্নায়ন তৈরি করেছি। অথবা সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এমন ত্রয়ী শ্লোগানের যে ফরাসী সামাজিক আন্দোলন তাকেও আমরা 'বিপ্লব' বলি, আবার রাশিয়ায় জার শাসন অবসানের বিরুদ্ধে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনকেও বিপ্লব বলে গণ্য করি। পূর্ণত মৌলিক বিচারে এই আন্দোলন-সংগ্রাম-বিপ্লব-বিদ্রোহের মধ্যে ইতিবাচক যে বিন্দুটি গুরুত্ববহ তা হলো, সর্বত্র ও সর্বকালে তার নৈতিক ও প্রতিবাদী উৎসটা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ। বিগত চার দশকে ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক আনুগত্যজাত পরিবর্তন এসেছে। রাজ-রাজড়ার বংশগাথা, অভিযান, সাম্রাজ্যের প্রবৃদ্ধি, শাসককুলের স্বার্থে আইনী ও সামাজিক সংস্কার চয়নের বিপরীতে সমাজের চারিত্র্যগত অবস্থান এবং সেই দিক থেকে সাধারণ মানুষের ইতিকথা রচনার একটা বলিষ্ঠ ধারা গড়ে উঠেছে।

এমন দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৫২ সালে শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ভাষা আন্দোলন সফলতার একটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাকে শুধু বাঙালির মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম নয় অবশ্যই সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ বলে পরিগণিত করা যায়। আমরা, সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানীদের 'অন্যায়' মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। হয়ত ঠিক ওই মুহূর্তেই পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ তার একটা তাত্ত্বিক অনুমোদন দিতে পারতেন। 'বিদ্রোহ' বলে তা দমন করতে পারতেন সীমাহীন অত্যাচারের মাধ্যমে এবং পেশাদার ঐতিহাসিকবৃন্দও হয়ত তার একটা তাত্ত্বিক অনুমোদন দিতে পারতেন।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত আমরা আরো নিপীড়নের পথ পেরিয়ে শক্তি অর্জন করেছি। কিন্তু বায়ান্ন এবং একাত্তর, উভয় কাললগ্নেই মৌলিক বিষয় ছিল- অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। একুশে প্রাথমিকভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, তাই এটাকে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ বলার মধ্যে যৌক্তিকতার কোন ঘাটতি নেই। আর একাত্তরে আমাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কর্মপরিকল্পনা তো বিদ্রোহের পর্যায়কে বাস্তবায়িত করে মুক্তিযুদ্ধেই রূপান্তরিত হয়েছিল। একুশের অমরত্বের মধ্যে তাই শতাব্দী অতিক্রান্ত সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সদর্থক যুক্তি ও অনুপ্রেরণা সর্বদাই জাগরুক থাকবে।

এত বছর পেরিয়েও এখনো একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে প্রতি বছরই যে এত লেখালেখি হচ্ছে, তা থেকেও এই দিবসের অমরত্বের দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য, এইটাই হয়ত সত্য যে, প্রতি বছরের এমন প্রবন্ধ-নিবন্ধ-বিশ্লেষণ, স্মৃতিচারণ ও কবিতাবলির মধ্যে অনেক পুনর্কথন বা পুনরাবৃত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে। সেটাও অনিবার্য, অজ্ঞাত কোন ইতিহাস তো এতদিন চোখের বা মনোযোগের আড়ালে থাকতে পারে না অথবা হৃদয় কিংবা চৈতন্যের যে চত্বরে একুশে-অনুসঙ্গী কবিতার জন্ম হয়, তার মধ্যে তো বড় রকমের কোন রূপান্তর ঘটতে পারে না। তবে দেশে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের পঠন-পাঠন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাল্টে যায় আমাদের এই বাংলাদেশে, কিন্তু অন্যায় এবং অত্যাচারের বির্মূত সংজ্ঞায়নে কোন ভিন্নতা তো ঘটে না। লেখালেখির মধ্যেও যে কোন বিবর্তন লক্ষ করা যায় না, তা নয়।

উনিশ শ' বায়ান্ন-উত্তর পাকিস্তানী শাসনামলের সবটা জুড়েই সারা দেশ জুড়েই একুশে উপলক্ষে স্মারক বা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের একটা অসাধারণ এবং অকৃত্রিম এবং দায়বদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। বিশেষত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে, পরিচিত জনদের কাছ থেকে সামান্য আর্থিক সহায়তা নিয়ে অথবা জানা-শোনা বিভিন্ন ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের কাছে কয়েকবার ধরনা দিয়ে যা জুটতো, তা দিয়ে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন ও রুচিসমৃদ্ধ একুশের প্রকাশনা বার করতো, অজস্র

অপটু হাতের কিন্তু আন্তরিক উচ্ছ্বাসের একুশের বিশেষ প্রকাশনার আয়োজনও দেখা যেত।

গত আশির দশকের প্রথম দিকে একটি বহুজাতিক সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অনুদান চাইতে। আমার বেশ মনে আছে, একজন কর্তাব্যক্তি বিভিন্ন উপলক্ষ-কেন্দ্রিক তাদের সংস্থার বাজেটটা আমাকে দেখিয়েছিলেন। প্রধান সব সংবাদপত্রসহ ছোটখাট সংকলনের জন্যও একুশে উপলক্ষে বরাদ্দ ছিল সেখানে। বিগত এক দশকে ঢাকায় তো বটেই, দেশের অন্যত্রও এমন সব সংকলনের প্রকাশনা আর চোখে পড়ে না। অথচ মনে পড়ে, একুশের পড়ন্ত সকালে শহীদ মিনারে ঠাসাঠাসি মিছিলের পর ফুল দিয়ে এসে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে যখন সবাই জড়ো হতাম, এমন সব সংকলক-লেখক-কবি-সম্পাদকদের দেখে না দেখার ভান করে অন্য দিকে সরে যেতাম। কারণ ইতোমধ্যে অনেকগুলো কেনা হয়ে গেছে এবং এমন কাতর চাহনিতে প্রত্যাশার ধ্বনিবদ্ধ ভাষায় ওইসব সংকলন কেনার জন্য তরুণ-তরুণীরা অনুরোধ জানাতো যে, তা প্রত্যাখ্যান করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এও জানতাম ওইসব সংকলনের অনেক লেখাই শুধুই পুরোনো কোন ভাল রচনার পুনর্মুদ্রণ অথবা কাঁচা হাতের কিছু কবিতা লেখার প্রচেষ্টামাত্র। আবার একথাও জানা ছিল যে, এরা হয়ত ছাপাখানের বিলটাও এখনো পরিশোধ করতে পারেনি, হয়ত সবটা শোধ করতেও পারবে না।

সত্যি বলতে কি, এখন আবার আমি অমন সব সংকলন নিয়ে আমার দিকে কেউ এগিয়ে আসবে, এমন একটা দৃশ্য রচনা করে নিজের ভেতর মুগ্ধতা ছড়াই, কেউ আসে না আর, স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি, সাহিত্যচর্চার এমন একটা বিশুদ্ধ আচার, সাংস্কৃতিক সংস্কার, একুশে উপলক্ষে এমন সৃজনী তৎপরতা সব হারিয়ে গেছে।

কিন্তু আজকের এই বাংলাদেশে কী বিপুলভাবে পাঠকসংখ্যা বেড়েছে, বিগত বিশ বছরে এক শতেরও বেশি নতুন দৈনিক আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক পুরোনো সংবাদপত্র হয়তো তাদের আদি কৌলীন্য হারিয়েছে, আবার নতুন পত্রিকা এসে প্রচারসংখ্যায় অনেক এগিয়ে গেছে। যাই হোক, বহুসংখ্যক দৈনিক পত্রিকাই তো একুশে উপলক্ষে আলাদা সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং প্রতি বছরই অন্তত এই উপলক্ষ-কেন্দ্রিক সাহিত্যসম্ভার যা গড়ে উঠেছে, তার আয়তন ও ভারটাও তো কম নয়। অবশ্যই উপলক্ষ-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার মধ্যে আচারের একটা প্রাধান্য থাকে। সাহিত্যের অঙ্গন ছাড়াও, একুশেকে যুক্ত করে সমাজবিবর্তন ও রাজনৈতিক বিষয়-আশয় নিয়ে বিবিধ আলোচনারও কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু ব্যক্তি বা সংঘ উদ্যোগে একুশে সংকলন প্রকাশের মধ্যে যে আলাদা রকমের দায়বদ্ধতা ও আন্তরিক সৌরভের সন্ধান পাওয়া যেত, তা আর সুলভ নয়।

আজকের তরুণ প্রজন্ম যে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত, সেকথা ভেবে একটু খারাপ লাগে। একুশে ফেব্রুয়ারির মহিমা অনেক ব্যাপক এবং তার প্রভাব অনাগত শত বছরেও যে ম্লান হবে না, এমন একটা সিদ্ধান্তে অনায়াসেই পৌঁছে যাওয়া যায় বিগত ছয় দশকের কালপরিক্রমা এবং একুশে উপলক্ষে আমাদের চেতনার নবায়ন ও বিবিধ প্রয়াস পর্যালোচনা করে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা-আন্দোলনের আত্মত্যাগ এবং একই সঙ্গে বিজয়ের যে বিশেষ বিন্দুকে চিহ্নিত করে, সেই পথ বেয়েই আমাদের পরবর্তী কালের বিভিন্ন গণসংগ্রাম এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা, অংশগ্রহণ এবং বিজয়। এমন একটা কালরৈখিক ইতিহাসকে আমরা সমকালীন ঘটনা পরম্পরার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছি। এ বিষয়ে যে কোন আলোচনা এখন বাহুল্যমাত্র।

একই ভাবে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আর্বিভাবও তো একুশে ফেব্রুয়ারিকে নতুন আলোয় দেখার জন্য আমাদের চৈতন্যগতভাবে প্রভাবিত করেছে। সংগ্রাম, যে সংগ্রামে দেশের আপামর জনসাধারণ সম্পৃক্ত অথবা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার স্বার্থ জড়িত থাকে, তার সাফল্য কিন্তু কোন পথের শেষ ফলক বা সুনির্দিষ্ট পরিণতি নির্দেশ করে না, যদিও সাফল্যের বিন্দু হতে পারে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় অথবা গন্তব্য। জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রত্যাশা ওই গন্তব্যবিন্দুকে একটি বিশেষ পর্বে বিন্যস্ত করে মাত্র।

মুক্তিসংগ্রামের দিশা ও নেশার মধ্যে যেমন ভাষা আন্দোলনের অদম্য সাহস, আত্মত্যাগ ও বিজয় অর্জনের লক্ষ্য নিহিত ছিল, তেমনি ১৯৭১ সালের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করার যে শপথ উচ্চারিত হয়েছিল তার মধ্যেও একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে উত্থাপিত দাবি বাস্তবায়নের নবায়ন শুরু হয়েছিল। যদি এরকম কল্পানুমান করা হয় যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেনি, তা হলে তখন থেকে হয়ত আরো কয়েক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের কালে অন্য সব দাবি অর্থাৎ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করতে হবে' প্রভৃতির সঙ্গে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টিও বার বার উচ্চারিত হত।

এই বিষয়টা পাকিস্তানী শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের এই দাবি অনেক সুদূরপ্রসারী হতে পারে এবং চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের আকাঙ্ক্ষাও এর মধ্যে অপ্রকাশ্য থাকে না। যাই হোক, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এমন আকাঙ্ক্ষা বা অধিকার নিয়ে আমাদের আর উচ্চকণ্ঠ হবার তেমন অবকাশ রইল না। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও অধিকার আদায় তা ঘটেই গেছে। কিন্তু একুশে মানে যে 'মাথা নত না করা' সেই আদর্শিক লক্ষ্যটা তো সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব সময়ই প্রযোজ্য।

বায়ান্ন সালের আন্দোলনে ভাষার প্রসঙ্গ ছিল একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু এই বিষয়টিকে যদি সাধারণভাবে মৌলিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি, তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই বলা যাবে যে, বাঙালির সেদিনের যুদ্ধ ছিল 'অন্যায়ের' বিরুদ্ধে এবং একইভাবে

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং পরিসমাপ্তি রচিত রয়েছে রাজনৈতিক অধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে, যদিও ঠিক একইভাবে ওই একাত্তরের লড়াইকে চিহ্নিত করতে হবে 'অন্যায়ের' বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সর্বাত্মক বিদ্রোহ হিসেবে। সুনির্দিষ্ট দাবি বা বিন্দু থেকে বিবর্তিত হয়ে আন্দোলন হয়ে উঠেছিল সামগ্রিক।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একটি ব্যাপক ও জোরালো দাবি ছিল 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'। এই স্লোগানের মধ্যেই কিন্তু চৈতন্যগতভাবে পাকিস্তানী শাসনের বিরোধিতা করা হচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক বিন্দু থেকে। ওই সময়রেখার মাত্র পাঁচ/সাত বছর আগে বাংলায় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ওই একই ধ্বনির উচ্চারণ শুনেছি আমরা। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনে শরিক হবার জন্য উপনিবেশবাদী শক্তি স্বাধীনতাকামীদের হাজারে হাজারে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। সেদিনের রাজনৈতিক নেতা ও গণমানুষ যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাইছিলেন অবিলম্বে এবং যাঁদের সক্রিয় কর্মকাণ্ডকে ওই ব্রিটিশ শক্তি তাদের শাসনের জন্য বিপজ্জনক মনে করেছিল, তাদের আটক করা হয়েছিল এবং চিরকালীন ও সমকালীন ইতিহাসে এমন প্রতিবাদকারীদেরই রাজবন্দী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন তুলতে চাই। ভাষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক এবং ঐতিহাসিক সাফল্যের ধারা বেয়ে পাকিস্তানী শাসনামলের অবসানের পর শুধু *দেশীয় শাসনকর্তাদের কোন পদক্ষেপ, নীতি বা শাসনরীতির প্রতিবাদ করার জন্য* যেসব ব্যক্তিকে স্বাধীন বাংলাদেশে জেলে আটক করা হবে বা রাখা হয়েছে, তাঁদের জন্য কি 'রাজবন্দী' আখ্যা আর প্রযোজ্য হবে? আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের যারা তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে শুধু পাকিস্তানীদের পদলেহন বা বাস্তব সহায়তা করে ক্ষান্ত হননি, বাঙালি নিধন, নির্যাতন ও ধ্বংসের জন্যও সচেতনভাবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, সেইসব ব্যক্তিকে আমরা যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছি, অবশ্যই আমি এসব পামর পাষণ্ড ব্যক্তির কথা বলছি না। এরা মানবতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই স্বাধীন বাংলাদেশেও 'অন্যায়ের' প্রতিবাদ করার জন্য অনেক ব্যক্তিকে এবং অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যও কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। স্বাধীন দেশে স্বদেশীয় শাসকদের এমন আচরণের শিকার ব্যক্তিবর্গকে আমরা আনুষ্ঠানিক ভাষায় কিন্তু রাজবন্দী বলতে পারছি না। কিন্তু একুশ মানে যদি হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, মাথা নত না করা তা হলে বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন আমলে ফাঁসিতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল তাহের কিংবা নিকট অতীতে সেনাবাহিনী অনুমোদিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে কারা ভোগ করা চারজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে তো রাজবন্দী হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। এবং মহান একুশে চেতনার ভিত্তিতে এমন রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো জনমত সংগঠিত হবার কথা।

বাস্তবতা এই যে, তেমন কোন কিছু ঘটেনি। একথা মানি যে, উর্দু এবং শুধুই উর্দুই হবে পূর্ব বাংলাসহ সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, এমন অন্যায় প্রস্তাবনা থেকেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সূচনা। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি মানতে পাকিস্তানী সরকারকে বাধ্য করার পরও তো আমরা নূরুল আমীনের বাসভবনকেই বাংলা একাডেমীর ভবন হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হবে এমন দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লড়েছি। এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এবং অভিভবকত্বে বাংলা ভাষা শুধু নয়, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বর্হিবিশ্বে পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এমন উদ্যোগ এমনই তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সুচিন্তা প্রসূত ছিল যে, তাকে কোনভাবেই ভাষাআন্দোলনের উপ-জাত প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের নিকট-উত্তর কালে আমাদের প্রবল আবেগ তো স্তিমিত হয়ে বা থিতিয়ে যায়নি, বরং ওই প্রাথমিক আবেগের আরও বহুমুখী প্রকাশ ও রূপান্তর আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠল। কী চমৎকার আর মধুর বাংলা শব্দে শিশুর, কোন সংগঠনের এমনকি বিপণি বিতানের নাম রাখা হত। মনে পড়ে, ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের একটা দোকানের নাম ছিল 'সাগর থেকে ফেরা'। আঞ্চলিক ভাষার কদর সামান্য হ্রাস না করেও ভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থেকেই ঢাকার উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রমিত উচ্চারণে ভাষার ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠল।

ছয় দশকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে এখন যখন দেশের সাম্প্রতিক কালের অনেকগুলি এফএম বেতার তরঙ্গের অনুষ্ঠানের ঘোষণা ও ওই প্রতিষ্ঠানের স্টুডিওতে তরুণদের আড্ডা ও তথাকথিত আধুনিকতার পরিবেশনায় প্রমিত ও আঞ্চলিক বাংলা এবং জোর করে অনুপ্রবেশ করানো বহু ইংরেজি শব্দের অশ্লীল ও উগ্র সংমিশ্রণ শুনতে পাই, তখন প্রতি বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে সারা বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে মাতৃভাষার যুগপৎ অধিকার এবং অবমাননার একটা ব্যাধি কেমন যেন আমাকে নির্জীব করে তোলে; যতটা বিষণ্ন করে তোলে ততটা প্রতিবাদী করে তোলে না, এমন অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে। তবুও একুশে অমর, একে কোনদিন সমাধিস্থ করা যাবে না, এই চেতনা থেকে স্বদেশী সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও প্রতিবাদী আন্দোলনের অঙ্গার ছড়াবেই চিরদিন বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ ফি উ ল আ ল ম

একুশে ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বহু দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশাগ্রস্ত আর শত কোটি সমস্যাকন্টকিত বাঙালি জাতির জীবনে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ছিল একটি ঐতিহাসিক গৌরবমণ্ডিত ও আনন্দঘন দিন। এই দিনে বাঙালি অর্জন করেছে তার প্রিয় মাতৃভাষা, প্রাণপ্রতিম মুখের ভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলো তাঁদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, নতুন করে আমাদের মাতৃভাষার বাংলার সপক্ষে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (United Nations Education, Science and Cultural Organization-UNESCO) ইউনেস্কো, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বাঙালির অমর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনেস্কোর ৫৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে পৃথিবীর ১৮৮টি বহুভাষিক ও বহুজাতিক সদস্যদেশ সর্বসম্মতভাবে বাঙালির প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি এই স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার ও বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বসমাজের প্রদর্শিত এই বিরল স্বীকৃতি ও সম্মান অনন্য, অতুলনীয়, বিরল ও মহান গৌরবের।

ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে দ্বিবার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়-

> ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি পেশ করার আগে ইউনেস্কোর ২৭টি সদস্য-রাষ্ট্র এ প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এককালে বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার হননকারী ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ বাঙালি নিধনকারী পাকিস্তানও এ ২৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে এ প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থক ছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিলাভ ৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহীদ রফিক, জাব্বার সালাম, বরকত, সফিউর, আওয়ালসহ সকল শহীদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়।

শ্রদ্ধা ও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় ১৯১৩ সালে এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, যিনি বাংলাভাষাকে প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়ে সদ্যস্বাধীন বাঙালি জাতির রাষ্ট্রভাষাকে বিশ্ববাসীর কাছে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলেন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় কানাডাপ্রবাসী বিশ্বমাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপের সদস্যদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানকে। স্মরণ করতে হয়, মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম থেকে শুরু করে এ যুগের মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে, যাঁরা অকুতোভয়ে বাংলাভাষার গৌরবের কথা উচ্চারণ করেছেন।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণার জন্য যাঁরা প্রথম ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন- কানাডায় প্রবাসী পৃথিবীর মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী দশ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুজন ফিলিপিনো, দুজন ইংরেজি ভাষাভাষী, একজন ক্যান্তানিজ ভাষাভাষী, একজন কাচি ভাষাভাষী, একজন জর্মন, একজন হিন্দি ও দু'জন বাংলাভাষাভাষী বরেণ্য ভাষাপ্রেমিক ব্যক্তি। আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয়, যে দু'জন বাঙালি এর প্রস্তাবক তাঁদের নাম হল-রফিক ও সালাম। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সেই রফিক ও সালাম যেন আবার হৃদয়ের গভীর আবেগ দিয়ে বিশ্বসভায় বাংলাভাষাকে গৌরবের বেদিতে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

১৯৯৮ সনের ২৯ মার্চ তাঁরা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে সর্বপ্রথম একটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের যৌক্তিকতা এবং এই দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্বীকৃতি প্রদান ও বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘ থেকে জানানো হয়, কোন বিশেষ গোষ্ঠী থেকে নয় বরং বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা সমীচীন। জাতিসংঘ অবশ্য এ ধরনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতার প্রশংসা করে। অতঃপর মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপের পক্ষ থেকে জনাব রফিকুল ইসলাম ২১শে জুন ১৯৯৯ বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনকে যে পত্র লেখেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন ত্বরিত গতিতে বিপুল উদ্যমে তা গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে

যথানিয়মে উপস্থাপন ও প্রেরণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষমন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো আনুষ্ঠানিকতার জন্য বিলম্ব না করে দ্রুত এই প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সম্মেলনে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পৌঁছে যায়। তারপর দীর্ঘ প্রক্রিয়া- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বের নানা জাতির নানা ভাষাভাষীর মধ্যে মতবিনিময় ও সর্বসম্মত যৌক্তিক সমর্থনের ফলে বাংলাদেশ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে বিরল এ গৌরব অর্জন করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি এখন আর বাঙালির রক্তেই শুধু রঞ্জিত একটি দিবস নয়, ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বের সকল মানুষের তথা বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্যে বিভূষিত দিন।

বাঙালির রক্তে এখন মিশে গেছে ফিলিপিনো, জর্মন, ইংরেজ, হিন্দি, ক্যান্তেনাজ, কাচি ও দু'জন মহৎ বাংলাভাষাভাষীর রক্ত। বাংলাভাষা ও বাঙালির এই নতুন বিভূষিত গৌরবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। আজ আবেগভরে বলতে ইচ্ছা করে-

> আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
> তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
>
> ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
> তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি বাঙালির ও বাংলাভাষাভাষীর দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাভাষার প্রচলন ও ব্যবহার, বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখনও আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আমরা উন্নীত করতে পারিনি। পৃথিবী জ্ঞানচর্চার যে ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে সে তুলনায় বাংলাভাষায় এখনও অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে বাংলার প্রয়োগকে আরও সমুন্নত করতে হবে।

বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের প্রধান লক্ষ্য হল-বিশ্বের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও জাতিসত্তার আপন আপন মাতৃভাষাকে সম্মান জানানো এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও বিকাশকে স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদান। সুতরাং মনে রাখতে হবে, বাঙালি জাতি তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে আত্মাহুতি দিয়েছে, হৃদয়ের আবেগ ও বুকের রক্ত দিয়ে তেমনি আপন-আপন মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকারও সবার রয়েছে। অন্যভাষার প্রতি বৈরিতা নয় বরং বিশ্বসমাজ গঠনে প্রতিটি ছোট বড় ভাষার প্রতি সম্মানবোধও এই 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ ফিলিপিন্স দীর্ঘদিন স্পেন, জাপান ও আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষার কবল থেকে বেরিয়ে এসে আপন আপন মাতৃভাষা দিবস 'তাগালো'কে এখনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। আফ্রিকার বহু ছোট ছোট রাষ্ট্র, তাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষার কবল থেকে বেরিয়ে এসে আপন আপন মাতৃভাষাকে এখনও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে পারে নি। স্কটল্যান্ডের জনগণ তাঁদের গ্যলিক উপভাষাকে এখনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইংরেজি ভাষার সমপর্যায়ে সমাসীন করতে পারেন নি।

আমাদের দেশেও চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, মণিপুরী ইত্যাদি জাতিসত্তার নিজস্ব যে ভাষা রয়েছে সেগুলো এখনো যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করে রাখার স্বার্থে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও জাতিসত্তার ভাষাকে স্বীকৃতি দান ও সংরক্ষণ করতে হবে। তাই, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ মাতৃভাষার অধিকার ও ভালোবাসায় যারা উচ্চকিত, তারা 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' থেকে পাবে নতুন প্রেরণা।

যে বাঙালি জাতিকে একদা আর্যরা 'পক্ষী'র জাতি হিসেবে নিন্দনীয় ভাষায় উল্লেখ করেছিল, যে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানের বাবা-ই-উর্দু আব্দুল হক তার অভিধানে 'বাঙালি' মানে 'ভূত' বলে ব্যঙ্গ করেছিল, সে বাঙালি জাতি তার প্রিয় বাংলা ভাষাকে মারণাস্ত্র হিসেবে হাতে তুলে নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধেই মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছে। এই মাতৃভাষার গৌরবের উদ্দীপ্ত পতাকা বুকে নিয়ে লড়াই করে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে তারা।

আজ থেকে প্রায় বারশো পঞ্চাশ বছর আগের এই বাংলা ভাষার চর্যাপদের কবি কানুপা, শবরীপা থেকে ক্রমে ক্রমে চন্ডীদাস, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ'র লেখনীর পথপরিক্রমা পার হয়ে বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানে উপনীত হয়েছে। বাংলা ভাষা এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম এখন বাংলা ভাষা। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভাষা বাংলা। এখন এইসব বহুমাত্রিকতার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা আন্দোলনের রক্তরঞ্জিত দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি পেয়েছে বিশ্বসমাজে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের মর্যাদা। এর ফলে বাংলাভাষীদের দু'ধরনের দায়িত্ব বেড়েছে। প্রথমটি হলো, দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাগুলো রক্ষা করা, এগুলোর লালন ও বিকাশে সহায়তা দান। দ্বিতীয়ত, আপন ভাষা বাংলার চর্চা, সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যথাযথ বাস্তবায়ন ও বিকাশের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আবেগ আর আনন্দ উল্লাসের মহরৎ আর বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়িয়ে এসব কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার স্বচ্ছ পরিকল্পনা ও দৃঢ় অঙ্গীকার।

অধ্যাপক শফিউল আলম
প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ

ড. এ কে এম খায়রুল আলম

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান

শিক্ষার গুণগত মানের উপলব্ধি

১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সময় থেকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন একটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডা হিসেবে স্বীকৃত। ঘোষণায় বলা হয়, সকল জাতির সকল শিশুর জন্য elementary education করা হবে free and compulsory পরবর্তী কালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতিসংঘ ঘোষণায় এ লক্ষ্যই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সহজে অনুভব করা যায় যে, ঐ সকল ঘোষণা ও অঙ্গীকারের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টি তেমনভাবে উচ্চারিত হয়নি। কিছু কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গ যেমন, মানবাধিকার, সুস্থ জীবন, দারিদ্র্য বিমোচন, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে শিক্ষার গুণগত মানের প্রসঙ্গটি এসেছে, কিন্তু কী ধরনের মানসম্মত শিক্ষা ঐ সকল মানবিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সুপারিশ নেই।

১৯৯০-এর দশকের প্রথম পর্যায়ে জমতিয়েন ঘোষণার সময় শিক্ষার মান বা মানসম্মত শিক্ষার চেতনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। তবে শুধু ভর্তির হার বৃদ্ধি যে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশে খুব কমই অবদান রাখতে পারে তার উল্লেখ করা হয় (It was recognized that expanding access alone would be insufficient for education to contribute fully to the development of individual and society) তাই এ সময় শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত মানের কথা না বলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে মানের প্রাসঙ্গিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

জমতিয়েন ঘোষণার এক দশক পরে ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন-এ স্পষ্ট করে বলা হয় যে, মানসম্মত শিক্ষার অধিকার রয়েছে প্রতিটি শিশুর। স্বীকার করা হয়, শিক্ষার মান হচ্ছে শিক্ষার হৃদপিণ্ড- মান দিয়েই পরিমাপ করা যায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও স্থিতির হার এবং অর্জিত যোগ্যতার মাত্রা। এ ঘোষণায়শিক্ষার গুণগত মানের সংজ্ঞার পরিধি ও উপাদান উল্লেখ করা হয়। যেমন, শিক্ষার্থীরা হবে স্বাস্থ্যবান ও নিবেদিতপ্রাণ; শিক্ষকদের থাকতে হবে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিখণবিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা হবে সুশাসন ও সম্পদ বন্টনে সুষম। শিক্ষার উত্তম গুণগত মান বিষয়ে এ সময় একটা স্বীকৃত এজেন্ডা তৈরি হয়। বস্তুত, ডাকার ঘোষণার ৬টি লক্ষ্যের ষষ্ঠ লক্ষ্যে বলা হয়, commitments to improve all aspects of education quality so that everyone can achieve better learning outcomes, especially in literacy, numeracy and essential life skills। এর পর থেকে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা বিষয়ক মনোদার্শনিক এবং মান-সচেতন সমাজতত্ত্ববিদগণ শিক্ষার গুণগত মানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা শুরু করেন। বাংলাদেশের শিক্ষাচিন্তায়ও access and quality সমানভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মানের সংজ্ঞা ও ক্ষেত্র

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে উল্লেযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে পরিমাণগত ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও গুণগত মান বিষয়ে এটি

মোটেও সন্তোষজনক নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার গুণগত মান বলতে আমরা কী বুঝি? প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মানের সংজ্ঞা, পরিধি ও উপাদান কতটুকু বিস্তৃত? গুণগত মান পরিমাপের জন্য মানের ক্ষেত্র, উপাদান ও তার নির্দেশকসমূহ কী?

প্রকৃতপক্ষে, গুণগত মান একটি উপলব্ধি বা একটি ধারণা। এ ধারণা আপেক্ষিক। পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষের চাহিদা, টিকে থাকার উপায় এবং মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে ব্যক্তিক জীবনের প্রত্যাশা পূরণ ও জাতীয় জীবনের উন্নয়ন সাধনের জন্য যতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি অর্জন করা আবশ্যক, ততটুকু জ্ঞান ও দক্ষতাকে শিক্ষার গুণগত মান বলা যায়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে শিশুদের বয়স অনুসারে ও শ্রেণিওয়ারি যোগ্যতা বিন্যস্ত করা রয়েছে। এসব যোগ্যতা অর্জন করলেই শিশুর যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে বা শিশুর শিক্ষা মানসম্মত হয়েছে বলে গণ্য হয়।

ভাববাদী ধারণায় শিখন একজন ব্যক্তির জ্ঞানসাধনা মাত্র, কিন্তু এ ধারণা এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন বলা হচ্ছে যে, learning has been reconceptualized from an additive process characterized by an individual's acquisition of knowledge to a socially-enabled developmental process। সমাজশক্তি আহৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শিখন বা শিখনের কাজ (শিক্ষণ) ব্যক্তির একক অনুধ্যান নয়, সামাজিক সহযোগিতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেই ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয় এবং তখনই তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিখনের মান অর্জনে সহযোগিতা অপরিহার্য। কার্যকর স্কুল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যেমন, শিক্ষক ও দায়বদ্ধ সমাজ-সদস্যবৃন্দ সমবেতভাবে শিখনে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এ সহযোগিতার জন্য রয়েছে নিম্নোক্ত ৪টি চিহ্নিত ক্ষেত্র:

ক. একটি শিখন-উপযোগী শ্রেণিকক্ষ

খ. জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দেশিত শিক্ষাক্রম

খ. শিক্ষাক্রমসম্মত বিষয়জ্ঞান, শিক্ষণ বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক এবং

গ. সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থন ও অঙ্গীকার।

মানের উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলোকে যে সব উপাদানে সাজানো যায় এই সংজ্ঞায় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের সকল ক্ষেত্রে উল্লেখ রয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে প্রাথমিক শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশে কোন না কোন ভাবে মানসম্মত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান

শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নের কোন একক কারণ বা চিহ্নিত উপাদান নেই। বরং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের সমাহার এ ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে; যেমন ঠাসাঠাসি শ্রেণিকক্ষে অসুস্থ শিশু কোন কিছু শিখতে পারে না; যদি শিক্ষক পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত না থাকেন, শিক্ষকের শিখন-শেখানো কাজ যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং শিখন সহায়ক পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে শিশুরা শিখতে আগ্রহী হবে না। মানসম্মত শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়োজন হয় পরিকল্পিত বিষয়বস্তু ও কর্মসূচিভিত্তিক কাঠামো। শিখন-শেখানো কর্মসূচির কাঠামো ও বিষয়বস্তুর উপাদানসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

- সুস্থ সবল ও পরিপুষ্ট শিশু শিখন অংশগ্রহণে আগ্রহী;
- শিখনে বিদ্যমান পরিবার ও সমাজের সহায়তা ;
- স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ, সংরক্ষিত এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমুক্ত শিখন পরিবেশ;
- প্রয়োজনীয় সকল মানব-সম্পদ ও বস্তু-সম্পদ ব্যবহারে ন্যায়ভিত্তিক সুযোগসুবিধা;
- মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাক্রম ও উপকরণের প্রাসঙ্গিকতা: বিশেষ করে সাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা, জীবনধারণের দক্ষতা, লিঙ্গসাম্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগ নিরাময় ও শান্তিরক্ষা বিষয়ক জ্ঞানের সন্নিবেশ;
- শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত শিক্ষক, সুব্যবস্থিত ও শিশুকেন্দ্রিক শ্রেণিশিক্ষণ পদ্ধতিসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ;
- শিখন-সহায়ক, উন্নয়নধর্মী ও নিরাময়মূলক মূল্যায়ন সমালোচনামূলক নয়;
- শিক্ষার অর্জিত শিখনফল হবে জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্নাত এবং জাতীয় লক্ষ্য ও সমাজ কল্যাণের সাথে সুসম্পর্কযুক্ত।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক বাস্তব অবস্থায় মানসম্মত শিক্ষার কাঠামো ও বিষয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের ভিন্নতা থাকতে পারে। নিচে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যে সব আবশ্যকীয় উপাদান বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

মানসম্মত শিক্ষার্থী

শিশু শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে যোগদান ও শিখনের সামর্থ্য থাকতে হবে। এ ছাড়া শিশু পুষ্টিসমৃদ্ধ, শারীরিক ও মানসিকভাবে উজ্জীবিত হবে এবং রোগবালাই ও সংক্রমণমুক্ত নিরাপদ ও

সুরক্ষিত পরিবেশ পাবে। শিশু যদি এমন সুস্থ ও নিরাপদ জীবন না পায়, যদি অস্বাভাবিক চাপের মাঝে থাকে, এ জন্য শুধু তার শিক্ষাজীবন নয়, ভবিষ্যতেও মনোসামাজিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। মানসম্মত শিখনের জন্য শিশুর এমন জীবন একান্ত প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে শিশুর এমন পরিচর্যা শুরু করা হলে প্রথম শ্রেণিতে সে নিজস্ব পঠন-পাঠনের ভুবন খুঁজে পায়। বিদ্যালয়ের সাথে স্বাস্থ্যসেবা যোগ করা গেলে সুস্থ শিশু ও মানসম্মত শিখন নিশ্চিত হয়।

সহায়ক পরিবেশ

সর্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার মানের বিষয়টি জড়িত। অনুন্নত ও নিরক্ষর জন-অধ্যুষিত দেশে প্রথমে তাই ভর্তির উপর জোর দেওয়া হয়। যে পরিবারের পিতা-মাতা সাক্ষর তাদের সন্তান নিরক্ষর হয় না, যে পরিবারের পিতা-মাতা শিক্ষিত সে পরিবারের শিশুরা শিখনের একটি সহায়ক পরিবেশ পায়। এ রকম পরিবারের শিশুরা মানসম্মত শিখন লাভ করে। সাক্ষরতা কর্মসূচি তাই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য।

সহায়ক ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যালয়ের ভৌত পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা শিশুদের মানসম্মত শিখনে প্রভাব বিস্তার করে। শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও শ্রেণিকক্ষের সজ্জাও শিক্ষকের পাঠপরিচালনার সময় তাকে বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগে উৎসাহিত করে, যেমন লাইন করে বসিয়ে লেকচার মেথডের পরিবর্তে গোল করে বসিয়ে মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতির ব্যবহার। এতদ্ব্যতীত শিশুর শিখনকে প্রভাবিত করে বর্ণিল পাঠ্যপুস্তক, আকর্ষণীয় শিক্ষা-উপকরণ, উপযুক্ত বসার জায়গা ও আসবাবপত্র। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও পানীয় জল শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতিতে অবদান রাখে। সুতরাং সম্প্রসারিত ভৌতসুবিধা ছাত্র: শিক্ষক অনুপাত, ছাত্র: শ্রেণিকক্ষ অনুপাত, শ্রেণিকক্ষের ভেতরে শিক্ষা-উপকরণ ও পুস্তক সাজানোর কর্নার স্থাপন, শিশুদের ছবি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত দেয়াল শিশুর শিখনকে আনন্দদায়ক করে, শিখনের মান উন্নয়নের জন্য যা অপরিহার্য। সমীক্ষায় দেখা গেছে ছোট আয়তনের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বড় শ্রেণির জনবহুল পরিবেশ থেকে শিখনে বেশি পারদর্শী।

একীভূত মনোসামাজিক পরিবেশ

মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রশক্তি হচ্ছে একীভূত ও বৈষম্যহীন শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ। একীভূত পরিবেশ শিশুদের স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করে, উপস্থিতি নিয়মিত করে এবং শিখনে মনোযোগী করে। এমন পরিবেশ মেয়েশিশু, সংখ্যালঘু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শান্তিপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করে। ফলে, শিখন-শেখানো কাজের মান নিশ্চিত হয়।

মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয়

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাক্রম শিশুদের শিখনে অনুসরণ করা হয় তা থেকে পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার জন্য জাতীয় লক্ষ্য থেকে উদ্ভূত পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহার যা থেকে পাঠের বিষয় পরিকল্পনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুরা বেঁচে থাকার জন্য জীবনে তাদের যে জ্ঞান ও দক্ষতা (কেবলমাত্র জ্ঞানার্জন নয়) প্রয়োজন, তা যেন অর্জন করতে পারে। বলা হয়, শিক্ষাক্রম এমনভাবে কাঠামোবদ্ধ হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণাত্মক ও সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা ও জ্ঞান লাভে সামর্থ্য অর্জন করবে। শিক্ষাক্রমে অবশ্য শিখনফলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রতি জোর দেওয়া হয়, যাতে লিঙ্গসাম্যবোধ, একীভূত চিন্তার সাথে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের লক্ষ্যবস্তু ঠিক করা যায়। বিভিন্ন পারিবারিক, শ্রেণিবলয় এবং ভিন্ন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীর চাহিদা এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং সকল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র হবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত শিখনফলভিত্তিক, আবার এ শিখনফল শ্রেণি ও বিষয় অনুসারে যথাযথভবে সুবিন্যস্ত থাকবে। শিক্ষার গুণগত মানের জন্য এমন শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, সজ্জিত শ্রেণিকক্ষ ও কার্যকর বিদ্যালয় পরিবেশ অপরিহার্য।

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক

শিশুদের শিখনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষণ কাজে শিক্ষকগণের অনেকের প্রস্তুতি পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। শিক্ষক প্রশিক্ষণে স্বল্প মনোযোগ, শক্তি ও প্রেষণা ব্যয় করা হয়। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা হয়। প্রশিক্ষণে উপর্যুক্ত দুটি জ্ঞানের ভারসাম্য রক্ষা করা হয় না। সমীক্ষায় দেখা যায়, বিষয়জ্ঞানে যেমন শিক্ষকগণ দক্ষ নন, তেমনি শিক্ষণের জন্য অপরিহার্য শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানেরও ঘাটতি রয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যথাযথ শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শিশুদের শিখনের গুণগত মান উন্নয়নের একটি নিশ্চিত পথ। শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এখনো অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক, শিক্ষক-কেন্দ্রিক, স্থবির এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। এ কারণে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে পাঠগ্রহণে, প্রশ্ন করতে ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে ভীত থাকে। অথচ মানসম্মত শিখনের জন্য শিখন-

শেখানো কাজ অবশ্যই শিশুকেন্দ্রিক হতে হবে, শিক্ষক কেবল সহায়ক মাত্র। শিখন- শেখানো শিশুকেন্দ্রিক হলে, শিশুরা সহজ থেকে জটিল বিষয়ে চিন্তা করবে, সমস্যা সমাধান করবে এবং দলীয় কাজের দ্বারা সহযোগিতামূলকভাবে শিখবে। এর ফলে শিশুদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ হবে এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্ম হবে। এ রকম পরিবেশে শিখন অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করবে।

গুণগত মান ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

বিভিন্ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয় যে, একবিংশ শতাব্দীর উন্মুক্ত, স্বাধীন, প্রযুক্তি ও দক্ষতানির্ভর বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের সম্মানজনক স্থান গড়ে তুলতে এক্ষুনি শিক্ষার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হবে। প্রতিবেদনগুলোতে আরো সতর্ক করা হয় যে, পরিকল্পিত উদ্যোগ না নিলে বাংলাদেশ একুশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকই অতিক্রম করতে পারবে না। এ সত্য উপলব্ধি করে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষাসংক্রান্ত প্রথম ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত উন্নয়ন সাধন করলেও গুণগত মান হতাশাজনক। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার অন্যতম উদাহরণ হল প্রগতিশীল জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৭৪) প্রণয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সরকারি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর এই মহতী পদক্ষেপগুলো অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে।

ক. একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৮০ দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৫৮% থেকে ৫৯.১০% , ঝরে পড়ার হার ছিল গড়ে ৮০%। স্থিতির হার ছিল গড়ে ২০%। ৯০ এর দশকে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬.২০% হয়, আর ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ৪৯.৬০% হয়, আর স্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫০.৪০% হয়। এ ভাবে ক্রমান্বয়ে সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পায়। ৭০ দশকে সাক্ষরতার হার ছিল ১৭%, ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ দশকে ৪৪% ও ২০০০ সালে ৬২% দাঁড়ায়।

খ. কিন্তু শুধু পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি নয়, গুণগত মানও ক্রমান্বয়ে ধীর গতিতে হলেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯২ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যেমন পড়ালেখা, এবং গণিতের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নে দেখা যায়, সদ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাত্র ৩৫ শতাংশ ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। ১৯৯৬ সালে পরিচালিত বিআইডিএস পরিচালিত অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪র্থ শ্রেণির শতকরা মাত্র ৩০ ভাগের অধিক শিক্ষার্থী শতকরা ৪০ ভাগের কম নম্বর পায়। অপরপক্ষে, শতকরা ১৩ ভাগ শিক্ষার্থী শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পায়।

গ. ১৯৯৯ সালে এনসিটিবির আইডিয়াল প্রকল্প পরিচালিত সমীক্ষায় বলা হয়, মূল বিষয় ইংরেজি, বাংলা এবং গণিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা আশাব্যঞ্জক নয়। সরকারি স্কুল অপেক্ষা রেজিস্টার্ড স্কুলের এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অর্জিত যোগ্যতা নিম্ন মানের।

ঘ. ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সালের বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে যথাক্রমে শতকরা ২২.৪০, ২৫.১৮ এবং ৩১.৬৮ ভাগ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে।

উপর্যুক্ত অপচয়, হতাশা এবং গুণগত মানের অভাব থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পিত হয়। এই প্রকল্পগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের উন্নয়ন। জমতিয়েন ঘোষণার পর বাংলাদেশে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। প্রকল্পগুলোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে এ সত্যের প্রমাণ মিলবে।

১. সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প (১৯৯০-১৯৯৫): সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের বড় অংশ জুড়ে ছিল ভৌত কাঠামো উন্নয়ন। অসংখ্য পুরাতন স্কুল সংস্কার, নতুন স্কুল নির্মাণ এবং স্কুলের কক্ষ সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের জরাজীর্ণ স্কুল পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের মাধমে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের নিকট স্কুলকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হয়। এনজিওদের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সরকারি স্কুল আকর্ষণীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করে, তবে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত প্রসারের সাথে সাথে গুণগত মানেরও উন্নয়ন সম্ভব হয়। এ প্রকল্পের সব থেকে বড় অবদান হচ্ছে, পরিমাণগত সম্প্রসারণ থেকে কীভাবে (success) গুণগত মানের (quality) দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

২. Primary Education Development Program (1996-97 to 2000-2001): এটি একটি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ধারণাপত্র। এটাকে ভিত্তি করে পরবর্তী দশকে অনেকগুলো প্রকল্পের কর্মসূচি রচিত হয়। এই দলিলে ভর্তির হার বৃদ্ধির বিষয় থাকলেও মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষার মান উন্নয়ন।

ধারণাপত্রের প্রথম দিকে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বত্র গুণগত মানের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হলে সর্বত্রগামী উপাদান যোগ করা প্রয়োজন। কোন খণ্ডিত সংযোগ দ্বারা শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়, বরং বিভিন্ন উপাদানের সমাহার প্রয়োজন। সিইনএড প্রশিক্ষণের

পর শিক্ষকদের শিক্ষণের বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন উদ্ভাবিত ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত করানোর আর কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ধারণা প্রস্তাব করা হয়। রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের সামগ্রী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন এবং একাডেমিক সুপারভিশন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করলে শিক্ষকদের পেশাগত মান অব্যাহতভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। বর্ণিত ক্ষেত্র ও উপাদানের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পরবর্তী সময়ে গৃহীত প্রকল্পগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের কার্যক্রম পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়। নিচে কতিপয় প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

আইডিয়াল প্রকল্প (১৯৯৭-২০০৪)

- মার্কিন শিক্ষামনোবিদ হাওয়ার্ড গার্ডনারের ভিন্নমাত্রার যোগ্যত্যাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন তত্ত্বভিত্তিক (Differentiated learning) বহুমুখী শিখন পদ্ধতির (MWTL) প্রয়োগে বাংলাদেশের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষের শিখন- শেখানো কাজ, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ-সংস্কৃতিতে শিক্ষার্থী- কেন্দ্রিকতার নবজন্ম হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।
- উপজেলা ও স্কুলভিত্তিক পরিকল্পনা এ প্রকল্পের একটি কর্মসূচি। শিক্ষক, সমাজ ও শিশুর নিকট স্কুলের চাহিদা এবং স্কুলের নিকট স্থানীয় জনসমাজের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে শিক্ষার মানোন্নয়ন এ কম্পোনেন্টের বৈশিষ্ট্য।
- ইউআরসি স্থাপন, এ জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।
- প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বগুণ বিকাশের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রচলন।

৩. নোরাড সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)

জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তব এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নততর মানের জন্য শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষের অনুশীলন বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত চাকুরীকালীন সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে (নেপ) এপেক্স ইনস্টিটিউট করা এবং নেপের মাধ্যমে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের নীতিনির্ধারণে সহায়তা প্রদান;
- থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি (ইউআরসি) গড়ে তুলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুপারভাইজার, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকদের দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা ইত্যাদি।

৪. জার্মান সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)

- জিটিজেডের অর্থিক সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বগুড়াকেন্দ্রিক একটি ছোট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভৌতসুবিধা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার মাধমে শিক্ষার মানোন্নয়ন; তবে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. ডিএফআইডি সাহায্যপুষ্ট ESTEEM প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৪)

এস্টিম প্রকল্প বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ব্যাপক ও বহুমুখী ভূমিকা রেখেছে। এ সময় যে কাজগুলো করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বর্ণিত হলো।

- **শিক্ষক যোগ্যতা নির্ধারণঃ** বাংলাদেশের একদল প্রশিক্ষক, সুপারভাইজার ও কর্মকর্তাদের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমাটন কলেজে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে ৬০ হাজার স্বীকৃত শিক্ষক যোগ্যতা সংগ্রহ করে বাংলাদেশের কনটেক্ট বিবেচনা করে ৩৭টি যোগ্যতা বাছাই করেন। এমফ ৩৭টি যোগ্যতা আবার ৬টি ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করে এর পারদর্শিতার সূচক (performing indicators) নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক যোগ্যতার ধারণা প্রচলন , শিক্ষক কর্তৃক এ যোগ্যতাগুলো অর্জন, সুপারভিশনে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক তা প্রয়োগ করে শিক্ষকের যোগ্যতা মূল্যায়ন ও উন্নয়ন।
- **একাডেমিক সুপারভিশন প্রচলনঃ** এই প্রকল্পে শিক্ষকযোগ্যতা ব্যবহার করে একাডেমিক সুপারভিশনের প্রয়োগ করা হয়। সুপারভিশনের ফলাফল সংরক্ষণের জন্য পুনরায় শিক্ষকযোগ্যতা ব্যবহার করে Record of Professional Development (RPD) উন্নয়ন করা হয়। এর ফলে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রগতি রেকর্ড করা সম্ভব হয় এবং আরও উন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন প্রথা চালু করা হয়। পিটিআইসমূহে

একইভাবে সিইনএড প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ, রেকর্ড সংরক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

- **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:** শিক্ষকযোগ্যতা, একাডেমিক সুপারভিশন, রেকর্ডসংরক্ষণ ও ফলাবর্তনের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণও নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়।
- **অংশগ্রহণমূলক, মিথস্ক্রিয়াধর্মী ও অনুচিন্তমূলক প্রশিক্ষণ প্রচলন:** বস্তুতপক্ষে এ নতুন ধারণাসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ সর্বাংশে অংশগ্রহণমূলক, মিথস্ক্রিয়াধর্মী ও অনুচিন্তনমূলক করা হয়। এ কারণে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারদের মধ্যে এক ধরনের প্রণোদনার সৃষ্টি হয়।
- **মানব সম্পদ উন্নয়ন:** প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এ কম্পোনেন্ট সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। এ প্রকল্পে দেশী ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির ফলে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও সুপারভাইগণ নবজীবনের স্বাদ পান। এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী কালে জার নেপ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে, পিটিআই এবং ইআরসি-তে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন।

৬. পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প-২(২০০৩-২০১১) মূলত access and quality উভয় ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, গুণগত মানের যে সব কম্পোনেন্ট পূর্বের প্রকল্পসমূহে বাস্তবায়িত হয়েছে তার প্রায় সবগুলো পিইডিপি-২ ও পিইডিপি-৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করা যাবে:

- Primary School Quality Level (PSQL) Standards- এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন;
- ভর্তি, উপস্থিতি এবং ৫-বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি;
- শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা;
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ;
- সকল পর্যায়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সকল পর্যায়ে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ;
- বিদ্যালয় পরিচালনা ও সহায়তা প্রদানে সমাজ বিশেষ করে পিতামাতার শক্তিশালী ভূমিকা।

৭. প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (২০১২-২০১৬)

- ভর্তি, উপস্থিতি এবং ৫-বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি;
- বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে বৈষম্য কমিয়ে, শিক্ষার্থীদের শিখনের মান উন্নয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি;
- শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক অর্জন-উপযোগী শিখনফল অর্জন অথবা যোগ্যতাসমূহ অর্জন;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়ন;
- শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন উন্নয়ন;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুর জন্য শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা-উপকরণ উন্নয়ন;
- শিক্ষক ও স্টাফের সকল স্তরের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের সংস্থান;
- প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট বরাদ্দে গতিশীলতা;
- উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কাজ বিকেন্দ্রীকরণ;
- সন্তানদের লেখা-পড়া শেখার ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য পিতামাতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ।

উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকল্পের সম্মিলিত লক্ষ্যসমূহ গুণগত মানের নিম্নোক্ত ৪টি ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা হয়:

১. প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন;

২. বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

৩. উন্নত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং

৪. মানসম্মত বিদ্যালয়ে সুষম ও সমতাভিত্তিক শিশু-ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও সহায়তা দান।

উপর্যুক্ত ৪টি ক্ষেত্র জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে করা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার বৈষম্যহীন ভর্তি এবং শিক্ষার সম ও টেকসই মানের সুষম বিকাশ সম্প্রসারণ করার জন্য অগণিত কার্যক্রম ঐ ২টি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন: সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গ

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম একটি ব্যবস্থা। পিইডিপি-২ এর একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, দশ ধরনের ৭৮,৬৮৫টি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৮১ জন শিক্ষক ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৯৪ জন শিক্ষার্থীর বিশাল সংখ্যার জন্য শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করে থাকেন। সরকার ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক আইন পাশ করে এবং শিশুর মানসম্মত শিক্ষার অধিকার রক্ষার্থে **সবার জন্য শিক্ষা** ও

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের জন্য অনেক সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

গৃহীত কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য, শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজ ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়।

অগ্রগতির একটা তুলনামূলক চিত্র

ক. ভর্তির হার:

১. গ্রস হার: ১৯৭২-৮০ সালের দিকে যেখানে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৫৮% থেকে ৫৯.১০% ভাগ। ক্রমান্বয়ে এ হার ২০০৫ সালে ৯৩.৭% ভাগ থেকে ২০১১ সালে ১০১.৫% হয় এবং ২০১২ সালে ১০৪.৪%।

২. নিট হার: ২০০৫ সালে ৮৭.২% ভাগ থেকে ২০১১ সালে ৯৪.৯% হয় এবং ২০১২ সালে ৯৬.৭%।

খ. ঝরে পড়া ও স্থিতির হার:

১৯৭২-৮০ সালের দিকে ঝরে পড়ার হার ছিল গড়ে ৮০% এবং স্থিতির হার ছিল গড়ে ২০%।

- ঝরে পড়ার হার ২০০৫ সালের ৪৭.২% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-এ ২৯.৭% এবং ২০১২ সালে ২৬.২ % হয়;
- স্থিতির হার ২০০৫ সালে ৫২.১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৭০.৩% উন্নীত হয়;

গ. প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার:

২০০৫ সালে ৫২.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৭০.৩% এবং ২০১২ সালে ৭৩.৮ % হয়।

ঘ. পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণের হার: ২০০৫ সালের ৯২.৪% থেকে ২০১১ সালে ৯৬% হয়।

ঙ. অনুপস্থিতির হার: ২০০৫-এর ২৩% থেকে ২০১১-এ ১৪.৯% এবং ২০১২ -এ ১৪% এ হ্রাস পায়।

চ. পুনরাবৃত্তির হার: ২০০৫ সালের বালক ১০.৭% এবং বালিকা ৯.৬%; ২০১১ সালে বালক ১১.৬% এবং বালিকা ১০.৬% এ এবং ২০১২ সালে ৭.৩% হয়।

ছ. সমাপনী পরীক্ষা: ২০১০ সালে ৯২.৩% এবং ২০১১ সালে ৯৭.৩% এবং ২০১২ সালে ৯৭.৩% (সরকার ব্যবস্থিত স্কুলের ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী) ও ৯৮.৫৮% এ (কেবলমাত্র সরকার ব্যবস্থিত স্কুলের শিক্ষার্থী) উন্নীত হয়েছে।

জ. শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার মাত্রা: ১৯৯৬ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা মাত্র ৩০ ভাগের অধিক সংখ্যক ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী শতকরা ৪০ ভাগের কম নম্বর পায়। শতকরা ১৩ ভাগ শিক্ষার্থী শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পায়। অপরপক্ষে, ২০১১ সালে তৃতীয় শ্রেণির বাংলায় ৬৭% শিক্ষার্থী এবং গণিতে ৫০% শিক্ষার্থী করেছে এবং ৫ম শ্রেণির বাংলায় ২৫% শিক্ষার্থী এবং গণিতে ৩২% শিক্ষার্থী অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিগত দশকগুলোর এতসব অর্জন সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ মানসম্মত শিক্ষার অর্জনে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যে সব চ্যালেঞ্জ বর্তমান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শিক্ষার নিম্নমান, ঝরে পড়ার প্রবণতা, পুনরাবৃত্তি ও অনুপস্থিতি বৃদ্ধি, শিক্ষণ-শিখনে গুণগত মান উন্নয়নে ঘাটতি, পাঠ-অগ্রগতি মূল্যায়নে দুর্বলতা, কেন্দ্রীভূত শিক্ষাপ্রশাসন, শিক্ষণে পেশাজীবীতা, মূল্যবোধসম্পন্ন জনবল, সমাজ সম্পৃক্ততার অভাব এবং সব থেকে ক্ষতিকর প্রাথমিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কতিপয় উপাদান, বাস্তবায়নের সমস্যা এবং সমস্যা উত্তরণের সুপারিশ আলোচনা করা হলো:

- **শিক্ষার্থী বিষয়ক সমস্যা:** দরিদ্র ও নিরক্ষর পরিবারের শিশুরা ভর্তি, উপস্থিতি ও স্থিতির ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারে না। পিতামাতা ও পরিবারের কাছ থেকে যে সহায়তা প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। গ্রামীণ ভূমিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণি মনোগঠনের দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক। গ্রামীণ সমাজ এদেরই নিয়ন্ত্রণে, তাই দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয়ের সুযোগ বঞ্চিত হয়। কৃষিজীবী পরিবারের পিতামাতা দারিদ্র্যের কারণে তাদের সন্তানকে কর্ম জগতে ঠেলে দেয়। এভাবে শিশুশ্রম উৎসাহিত হয়। যারা স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের অনেকে অকালে ঝরে পড়ে বা অনিয়মিতভাবে স্কুলে আসে। এর ফলে, শ্রেণি-কার্যক্রম ও পাঠের অগ্রগতি থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে। এভাবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সুপারিশ: শিশুর গৃহ পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ শিশুর শিখনের অনুকুল করা সম্ভব হলে শিশু স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পাঠে মনোযোগী হবে। কার্যকর, সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এসএমসি প্রচলন এবং স্থানীয় সরকারের অধীনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন করা হলে এ সমস্যা অনেকটা দূর হবে। আর শ্রেণি কার্যক্রম সক্রিয় ও আনন্দদায়ক করা হলে শিশুরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্কুলে আসবে। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

- **শিক্ষাক্রম বিষয়ক সমস্যা:** আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি (১৯৭৫) প্রণীত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত করে। নতুন শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তক, শিখন-শেখানো নির্দেশনা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন সন্নিবেশিত করে শিক্ষক সংস্করণ ও সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়। তখনকার এ উদ্যোগ দেশের প্রচলিত শ্রেণি-পরিচালনার সংস্কৃতিতে ব্যাপক

পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। কিন্তু শিক্ষকদের নিকট বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। শিক্ষাক্রম অনুসরণে শিক্ষার্থীরা যে প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ এবং শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে সে সম্পর্কে শিক্ষকদের অনেকের জ্ঞানের ঘাটতি ছিল। উল্লেখ্য, নাগরিক মধ্যশ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের প্রণীত এ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনেকাংশে আরোপিত হওয়ায় প্রচলিত শ্রেণিপাঠনের সংস্কৃতির সঙ্গে এর একটি সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সুপারিশঃ বর্তমানে শিক্ষাক্রম রিভিউ করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। নতুন শিখনফল ও নতুন পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সংস্করণ ও সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে যেন একটা সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হয়। বিষয়ভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার কর্মশালা ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকেন্দ্রিক চাহিদাভিত্তিক ও অনুচিন্তনমূলক যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে শিক্ষাক্রমের বিষয়টি সেখানে যুক্ত করা যেতে পারে। সহকারী উপজেলা অফিসারদের একাডেমিক সুপারভিশনেরও বিষয় থাকতে পারে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে।

• **শিক্ষাসামগ্রী ও শিখন উপকরণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাঃ** শিক্ষাসামগ্রী ও শিখন উপকরণ প্রণয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ একটি পেশাগত কাজ। শিক্ষণ ও শিখনকে কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষা-উপকরণ প্রয়োজন। উপকরণের প্রকৃতি এবং উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকতে হবে। শিক্ষা-উপকরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনসিটিবি-এর যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স চলাকালীন পিটিআইগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু ইনস্ট্রাক্টরদের প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পাঠদানের অভিজ্ঞতা না থাকায় এ ভূমিকা পালনে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

সুপারিশঃ ইউআরসি এবং সাব-ক্লাস্টারে পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রণয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। ডিপিএড কোর্সের পেশাগত শিক্ষা বিষয়ে শিখন-শেখানো উপকরণ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা রয়েছে। শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্যে ইউআরসি ও চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টারে এ বিষয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা শিখন-শেখানোর মান-উন্নয়নের সহায়ক হবে।

• **শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষা ও শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নঃ** চাকুরীপূর্ব ও চাকুরীকালীন (সিপিডি) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উভয় ক্ষেত্রে একটা শক্ত বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে। অসবাবপত্রসহ কাঠামোগত ভৌত সুযোগসুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছে (পিটিআই , ইউআরসি), প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হয়েছে (সাব-ক্লাস্টার, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং নেপ), হাজার হাজার শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক সিইনএড (পিটিআই) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং হাজার হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পরিবীক্ষণ ও সুপারভিশন পদ্ধতি, শিক্ষক যোগ্যতা (মান) বিদ্যমান রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের শিখনফলও চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, কতিপয় গবেষণা এবং মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সাধারণভাবে সকলে একমত যে, চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ বা সিপিডি কোনটাই শিক্ষণ আচরণের কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি, অপর দিকে অনুসারক কাজ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া বস্তুত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে চলছে।

• **সুপারিশঃ** প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন একটি সার্বিক ও শিক্ষকের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বিশেষ। এ জন্য প্রয়োজন, বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের ভিত্তিতে শিক্ষকদের চাকুরীপূর্ব শিক্ষক-শিক্ষা ও চাকুরীকালীন জীবনব্যাপী ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন। এবং বিদ্যালয় ও সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা। বর্তমান ডিপিএড কোর্স, চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং ইউআরসি-কেন্দ্রিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে শিক্ষকমান ও শিক্ষকযোগ্যতার কাঠামো বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ডিপিএড কোর্স যদি তার তত্ত্বগত ভিত্তি অনুসারে পিটিআই ও প্রশিক্ষণ স্কুলে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে মানসম্মত শিক্ষক অবশ্যই তৈরি হবে।

• **পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশনঃ** শিক্ষাযোগ্যতার আলোকে একাডেমিক সুপারভিশন পরিচালনার ধারণা এস্টিম প্রকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হয়। এ সুপারভিশনে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার শিক্ষকদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে তাদের পাঠের ভালো দিক ও উন্নয়নের দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন দেন। অব্যাহতভাবে এ ফলাবর্তন ও ফলোআপের মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন চলতে থাকে। একাডেমিক সুপারভিশনের এ উত্তম পদ্ধতিটি এখন আর তেমনভাবে ব্যবহার করা হয়না। এর ফলে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে।

• **সুপারিশঃ** প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর প্রধান ডক্যুমেন্টে একাডেমিক সুপারভিশন ও মেন্টারিং কম্পোনেন্ট দুটি পরবর্তী ডিপিপি-তে প্রতিফলিত না হওয়ায় এ কার্যক্রম নিয়ে তেমন কাজ হচ্ছে না। একাডেমিক সুপারভিশন ও মেন্টটরিং প্রচলন করা গেলে শিক্ষক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে

এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

• **সমাজ সম্পৃক্ততা ও উদ্বুদ্ধকরণ:** বিদ্যালয়কে একটি শিখন-উপযোগী পরিবেশে রূপান্তর এবং শিখনের নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসএমসি ও পিটিএ এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়কে একটি কম্যুনিটি লার্নিং সেন্টার বা সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা গেলে বিদ্যালয়কে ঘিরে আবর্তিত হবে স্থানীয় সমাজের সকল কাজ।

• **সুপারিশ:** সমাজকে বিদ্যালয়মুখী করার জন্য এসএমসি-কে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। School Level Improvement Plan (SLIP) তত্ত্বগতভাবে এমন একটি কর্মসূচি যা সমাজকে পুনরায় স্কুলের উন্নয়নে ফিরিয়ে আনতে পারে। সুপরিচালিত স্কুল মানসম্মত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। তবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সুপাভিশন ও কার্যকর ফলাবর্তন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

• **ভৌত- অবকাঠামোগত সমস্যা:** ১৯৭১-১৯৯০ দশকগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার ভৌত কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরবর্তীকালে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ পর্যন্ত এ অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। জরাজীর্ণ স্কুল ঘর, উপজেলা অফিস ঘর, জেলা প্রাথমিক অফিসারের কার্যালয়, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, পিটিআই ও নেপ সম্প্রসারণ, হোস্টেল নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ৫টি শ্রেণি, ৩/৪ জন শিক্ষক এবং অনেক স্কুলে ৩/৪টি কক্ষ রয়েছে। এখানে ৫টি ক্লাশ একযোগে পরিচালনা করা অসম্ভব। এখানে আন্তর্জাতিক মানের সংযোগ ঘন্টা রক্ষা করে মানসম্মত শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করা একটা স্বপ্নবাস্তবতা মাত্র। শিক্ষক:ছাত্র অনুপাত কমিয়ে এনে শিশুকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ করা দুঃসাধ্য বিষয়।

পিটিআইগুলোর অবস্থা সংকটাপন্ন। ডিপিএড পরিচালনার সময় ৬টি শ্রেণিতে পাঠদান করতে গিয়ে দেখা গেল, বাস্তবে ৬টি ক্লাশ পরিচালনার জন্য কোন উপযুক্ত ঘর নেই। পিটিআইগুলোতে ২০০ শিক্ষার্থীর জন্য ১:৩৫/৪০ জন অনুপাতে ক্লাশ করা যায় না। হোস্টেলে সকল শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় না। পিটিআইগুলোতে শিক্ষক সংকটসহ ডিপিএড পরিচালনার জন্য অপরিহার্য উপকরণ নেই। অথচ মানসম্মত শিক্ষক তৈরি, অংশগ্রহণমূলক ও মিথষ্ক্রিয়াধর্মী শ্রেণি সৃষ্টি করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ডিপিএড বর্তমানে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে প্রধান কর্মসূচি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

সুপারিশ: প্রতিটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক কক্ষ, স্টাফ কক্ষ, লাইব্রেরি, স্টোরসহ কমপক্ষে মোট ১০টি কক্ষ থাকতে হবে। ডিপিএড বাস্তবায়নের জন্য প্রতি পিটিআইতে ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগের আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতি ইনস্ট্রাক্টরকে ১টি ল্যাপটপ, ন্যুনতম ৬টি শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করে ৬টি মাল্টিমিডিয়া সংযোগ স্থাপন করতে হবে। কমপক্ষে ২০০ শিক্ষার্থীর হোস্টেল সুবিধা থাকতে হবে। সম্পূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সটি আবাসিক করতে হবে। প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, যেমন পোস্টারপেপার, মার্কার ও ডিসপ্লেবোর্ড থাকতে হবে। তাহলে প্রশিক্ষণের মান ও শিক্ষকের মান নিশ্চিত করা যাবে।

• **দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা:** উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশে উচ্চতম পর্যায়ের অঙ্গীকার রয়েছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি অঙ্গীকার এবং দায়বদ্ধতা যদি সর্বব্যাপী হয়ে তৃণমূল স্পর্শ না করে, তাহলে বিপুল অর্থ ব্যয় ও কর্মযজ্ঞ সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে কেন পারে না? এখন তো অনেক স্থানে ভৌতসুবিধা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিস, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ২০টি স্কুলের জন্য একজন ক্লাস্টার কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষোপকরণ, শিশুদের জন্য খাদ্য, উপবৃত্তি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবু কেন শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়।

• **সুপারিশ:** কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়কদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য একটি পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সেল গঠন করা প্রয়োজন। এই সেল নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত হবে এবং সেল কেবলমাত্র সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। এদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুরস্কার (পদোন্নতি) ও তিরস্কারের (ইনক্রিমেন্ট স্থগিতকরণ, বদলী, পদাবনতি, চাকুরীচ্যুতি) ব্যবস্থা নিবেন। এমনটি পদক্ষেপ নিলে শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য বেশি অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হবে না।

উপসংহার: বলা যায় যে, বিশালত্বই প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বলতা। বিপুল ও বিশাল প্রাথমিক শিক্ষা উপখাত সম্পর্কে কেউ যদি এমন উপলব্ধি ব্যক্ত করেন তা হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং এ উক্তি প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিশাল পরিধি, এর অনন্ত সম্ভাবনা, বহুমুখী সাফল্য এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যর্থতার বাস্তবতার প্রতীকী উচ্চারণ। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট না হলে, এ খাতের সাফল্য, ব্যর্থতা এবং এর শক্তি ও সমস্যার বহুমুখিতা ও বহুমাত্রিকতা উপলব্ধি করা যায় না।

ড. একেএম খায়রুল আলম
অধ্যাপক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

তপন কুমার দাশ

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন: কে শত্রু কে মিত্র?

বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের পরিসর দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে, কলেবরও বাড়ছে। শুধু বাংলাদেশে কেন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাপীই ছড়িয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী। শুধুমাত্র মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবীতে বুকের রক্ত ঢেলে দেওয়া সাহসী মানুষদের গল্পগাথাও পৌঁছে যাচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। এটাই আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার।

অনেকেই বলেন এবং আমরাও একমত যে, ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নয়, এ আন্দোলন ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনগড়া শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ। এক সময় এ প্রতিবাদ বিক্ষোভে পরিণত হয় আর ব্যাপক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আদায় হয় বাংলা ভাষার দাবি। এ ঘটনার সূত্র ধরেই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠে এবং চব্বিশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এক সময় অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

একথা অনস্বীকার্য যে ভাষার জন্য আন্দোলন তথা আমাদের স্বাধীনসত্তা বিকাশের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষাসমূহ, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলা ভাষার বিকাশ এবং শতভাগ শিক্ষিত জাতি গঠন। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত মানেই ভাষা লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারার সক্ষমতা। এ আকাঙ্ক্ষাই একসময় সর্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন রূপ পায় আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে অন্তর্ভুক্ত লাইন ক'টির মাধ্যমে। যেখানে বলা হয়েছে "মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো"।

বাঙালি মাত্রই জানেন কী অভিপ্রায়ে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। কী অভিপ্রায়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিল লক্ষ লক্ষ বাঙালি সন্তান। এটা কি বিশ্বের মানচিত্রে শুধু একটি আলাদা ভূখণ্ডের জন্য? শুধুমাত্র আলাদা সরকার, আলাদা সঙ্গীতের জন্য? এসব কিছুর মর্মমূলে কি অন্য আরো হাজারো রকমের স্বাতন্ত্র্যবোধ, হাজারো রকমের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না?

একথা সত্য যে, দীর্ঘ সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, কিংবা বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিংবা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের যে আকাঙ্ক্ষা তা আমরা কতটুকু অর্জন করেছি? আর কেনই বা অর্জন করতে পারিনি। তা নিয়েই আজকাল জোরালো প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে নাগরিক সমাজে। আর এসব প্রশ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরেই আসছে আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা ও ব্যবহারের কথা। প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, আমরা যত না আড়ম্বর করছি, মাতৃভাষার চর্চা বা পরিচর্যা ততটা করতে পারছি কিনা। যদি না পেরে থাকি তাহলে কেনই বা আমাদের এ দৈন্য। এর জন্য কে দায়ী, কিংবা কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা পারছি না প্রভৃতি বিবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়।

এসব ইস্যু কিংবা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা একটি জটিল ব্যাপার। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি বিশেষ শ্রেণি আমাদের ভাষা আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল এলিট শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। বাংলাদেশ পূর্ববর্তী সময়ে শাসন

ক্ষমতার শীর্ষভাগই ছিল এই এলিট শ্রেণির হাতে। স্বাভাবিক কারণেই সে ক্ষমতাকে করায়ত্ত করে রাখার জন্যে তারা স্থিতাবস্থাকেই সমর্থন করেছিল, আর তাদের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিল সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ।

এসব কারণেই এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অবশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু, সব মানুষের মধ্যেই এলিট হওয়ায় বাসনা থাকে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ বাসনা প্রবলতরভাবে দেখা দেয়। আশ্চর্যজনক হলেও এটা সত্য যে, দীর্ঘ দু'শ-আড়াইশ বছর ধরে, বিশেষ করে চব্বিশ বছর ধরে বাঙালিরা যে সব দাবি নিয়ে সংগ্রাম করল, বুকের রক্ত ঝরালো, স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পর অনেকেই তা অনেকাংশেই ভুলে গেল এবং তাদের আচার-আচরণ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে নিজেদেরকে এলিট শ্রেণির অনুরূপ মানুষে পরিণত করার কৌশল ও অনুশীলনে তৎপর হয়ে উঠল। যাদের বয়স বর্তমানে আশির কাছাকাছি তারা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে মাতৃভাষার লেখাপড়ার চর্চাকে সমুন্নত রাখা। কিন্তু পাকিস্তান আমলে বুনিয়াদি শিক্ষার এক রকম কবরই রচনা করা হলো। আর বাংলাদেশ আমলে তা একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

বাংলার কৃষক-শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কি চেয়েছিল?

বলা বাহুল্য, এ দেশের আপামর মানুষ কোটিপতি হওয়ার বাসনা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। সীমিত সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দু বেলা দু' মুঠো ভাত খেয়ে একটু শান্তিতে দিন কাটানোই ছিল তাদের বাসনা। তাদের সন্তান সন্ততিরা বাড়ির কাছে পাঠশালা কিংবা বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার ও সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করবে এটাই ছিল কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা। ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চায় সম-অধিকার অর্জন করবে এটাই ছিল তাদের বাসনা।

ভাবতে অবাক লাগে, এক রকম প্রকাশ্যেই এদেশে স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই গজিয়ে গেল শত শত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। দেশজ বইপত্রের অভাব কিংবা শিখন পদ্ধতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক রকম ধুয়া তুলে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করল বিদেশি ভাষা ও ভাবধারায় রচিত বিদেশি বইপুস্তক। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরবর্তী কালে কোচিং সেন্টারগুলোর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল করল এবং অনেকেই পাড়ি জমাল বিদেশে আবার অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এদেশেই।

একইভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি লাফিয়ে পড়ল তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অবশ্য তাদের কাছে অন্য কোনো বিকল্পও ছিল না। কেন এ অবস্থা সৃষ্টি হলো তা সহজেই অনুমেয়।

অনেককেই বলতে শুনেছি স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে বুর্জোয়ার হার ছিল একভাগ। স্বাধীনতার পর এ হার বেড়ে গিয়ে হলো ছাব্বিশ ভাগ। এই নব্যবুর্জোয়ারা নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলল সমাজের বৃহত্তর কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি থেকে। তারাই তাদের সন্তানদেরকে গ্রাম থেকে তুলে এনে ভর্তি করিয়ে দিল ঢাকাস্থ কোনো কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। সেখান থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে তারাই পরিণত হলো এলিট শ্রেণিতে। এভাবেই মূলত এলিট শ্রেণির আয়তন বেড়ে গেল এবং তাদের কাছে বাংলা ভাষা চর্চা কিংবা পরিচর্যা করার কোনো গুরুত্বই থাকল না।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "মাত্র দশভাগ মানুষ আপনারা শিক্ষিত শ্রেণি। কিন্তু কার টাকায় আপনারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। এ টাকার যোগান দিয়েছে আমার কৃষক, আমার শ্রমিক। তাই তাদের স্বার্থ ভুললে চলবে না।"

বুঝতে হবে কোনো মানসিক অবস্থা থেকে বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর ভাষণে এ কথাগুলো বলেছিলেন। সুস্পষ্টভাবে বঙ্গবন্ধু সেদিন সমাজে এ বিভাজন দেখেছিলেন এবং দিন দিন এ বিভাজনের বর্ধিষ্ণু রূপ দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদের সিংহভাগই ছিল এলিট শ্রেণিভুক্ত এবং মুক্তিযুদ্ধ ছিল কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সংগঠিত একটি জনযুদ্ধ। এই জনযোদ্ধারাই ভাষার দাবি কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে কোনঠাসা হয়ে গেল স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের মধ্যেই।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তের এক আলোচনায় মহামতি হেরোকিটিস আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ভাষা স্থবির নয়, পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন সাধিত হয় সময়ের প্রয়োজনে। কেননা, দিনকে দিন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভূত উন্নয়নের ফলে ভাষায় সংযোজিত হয় নতুনতর শব্দ, যা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। আরো দশটি ভাষা থেকে দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে ভাষা বিকশিত হয়। এটাই ভাষার সম্ভাবনা, ঐশ্বর্য। বিকশিত হওয়ার এ পর্যায়ে ভাষা বিস্তৃত হয়, পরিশীলিত হয়। নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষেরা এ বিকাশমান ধারার পরিচর্যা করে, এটাই নিয়ম।

কিন্তু হেরিকিটিসের মতে, যে জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষার পরিচর্যা করবে তারা যদি মাতৃভাষাকে দূরে ঠেলে রেখে অন্য কোনো ভাষার দিকে ধাবিত হয় তখনই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। আর এ দ্বন্দ্বে কোনঠাসা হয়ে পড়ে দুর্বল শ্রেণির মুখের ভাষা। এ প্রসঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, "ভাষাও বদলায় দ্বন্দ্বের" কারণেই। প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশিতব্যের একটা বিরোধ চলতে থাকে। গ্রহণের ইচ্ছা ও গ্রহণের ক্ষমতার ভিতর একটা ঝগড়া বাধে এবং উভয় দিক থেকেই ভাষা প্রতিবাদ করে তার নিজের বিরুদ্ধেই-নিজের সীমা,

দুর্বলতা, অপূর্ণতার বিরুদ্ধে। সেই প্রতিবাদেই সে এগোয়। ক্রমাগত এই ঘটনা যদি না ঘটে, যদি থেকে যায় দ্বন্দ্ব তথা প্রতিবাদ, তাহলে বুঝতে হবে তার মৃত্যু অত্যাসন্ন।"

এখন কথা হচ্ছে বাংলা তো দুর্বল শ্রেণির মুখের ভাষা নয়। তবু ভাষার বিস্তৃতি কিংবা বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? আমার পরিষ্কার মনে আছে- আশির দশকের সূচনালগ্নে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করার সময় আমরা কতিপয় মানুষ সর্বস্তরে বাংলা চালু করার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'এসইপি' নাম পরিবর্তন করে গণশিক্ষা রাখলাম। বাংলায় চিঠিপত্র আদান প্রদান চর্চা চালু করতে চাইলাম। কিন্তু একটি শ্রেণি এ নিয়ে আমাদের ঠাট্টা-তামাশা করল এবং আমাদেরকে আশিক্ষিত মূর্খ আখ্যা দিয়ে তারা দপ্তরিক কাজকর্মে ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিল। বলা বাহুল্য, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সকল প্রয়াস শুধু ব্যর্থই হলো না, আমরাও সরে গেলাম পেছনের কাতারে। অথচ আমাদেরই সঙ্গে থাকা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল থেকে পাশ করা কিংবা ইংরেজি ভাষার সমর্থকরা বিদেশি বস্‌দের অনুকম্পা আর অনুগ্রহ পেয়ে তরতর করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ভাষা নিয়ে চিন্তা করেন কিংবা গবেষণা করেন এমন সকলেই জানেন বাংলাদেশে বিগত ত্রিশ বছরে যে সব সামাজিক গবেষণা হয়েছে, তার নিরানব্বই ভাগই হয়েছে ইংরেজিতে। দেশের যতসব কর্ম-কৌশল, বাজেট কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সবইতো ইংরেজিতে। কর্পোরেট সেক্টর, উন্নয়ন সেক্টরসহ হেন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে ইংরেজিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অথচ এদেশের পঁচানব্বই ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা এবং নব্বই ভাগ মানুষ ইংরেজি বুঝেই না। হেরোকিটিসের মতে, এটাই দ্বন্দ্ব আর এ দ্বন্দ্ব চলছে সারা দুনিয়া জুড়ে। শুধুমাত্র কর্পোরেট কালচার কেন, শহরের অলিগলি এমন কি মফস্বল শহরের দোকানের সাইনবোর্ডে আজকাল আর বাংলা দেখাই যায় না। হলেও তা এমন বাংলায় যা অনেকেই পড়তে পারে না। ফ্লাট ফর সেল, ফাস্টফুড, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার নেই। কেউ প্রয়োজনও মনে করছে না।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যারা ইংরেজি ভাষার চর্চা করেন, তাদের অনেকেই দু'চার লাইন বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে পারেন না। বলতেও পারেন না। এ নিয়ে তাদের নিজেদের, কোনো লজ্জা নেই। তাদেরকে কেউ তিরস্কারও করেন না। কিন্তু কোন সম পর্যায়ের বাঙালি ইংরেজিতে একটু ভুল করলে তার প্রতি তিরস্কারই শুধু নয়, গালমন্দের আর কমতি থাকে না। আরো চমকপ্রদ বিষয় হলো যারা ভালো বাংলা জানেন না কিন্তু ইংরেজি ভাষায় পরিচর্যা করতে উদগ্রীব তাদের ইংরেজি ভাষাও যে নিম্নমানের তাও তারা বোঝেন না। তবে ইংরেজি বলা বা লেখার সুবিধা হলো, যেহেতু আপামর মানুষ ইংরেজি বোঝেন না বা জানেন না তারা তার ভুলত্রুটি ধরতে পারে না। তাছাড়া ঐসব লেখা কেউ পড়ার দরকার মনে করে না বলে তার ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনাও হয় না। কিন্তু, একথাও তো ঠিক যে, যে বাঙালি বাংলায় বাক্য গঠন করতে পারে না, সে ইংরেজিকেও দুর্বোধ্য করে তোলে।

মাতৃভাষা চর্চার আলোচনা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নিয়ে নয়। একই সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে বাংলাদেশে বসতিরত আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সব মানুষদের মাতৃভাষা নিয়ে। প্রফেসর মেজবাহ কামাল তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, এদেশে বাংলা ছাড়াও প্রায় সত্তরটি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার কথা বলে। তাদের অনেকেরই নিজস্ব বর্ণমালাও রয়েছে। মাতৃভাষার পরিচর্যা মানে সব জাতিগোষ্ঠীর শিশুদেরই তাদের ভাষায় লেখাপড়া করা এবং চর্চা করার অধিকার সমুন্নত রাখা। এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে সেখানেও এলিট শ্রেণি রয়েছে এবং তাদের ভূমিকাও অপরাপর ক্ষেত্রে বিদ্যমান এলিটদের মতোই।

সে যাই হোক, হেরোকিটিস এবং প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর আলোচনায় আবার আসি এবং তাঁরা উভয়েই যে আক্ষেপ এবং আশঙ্কা করেছেন তা নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। শুধুমাত্র সরকার নয় নাগরিক সমাজকেও এ বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আমরা অফিস-আদালতে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি জানাকেই প্রাধান্য দিই তাহলে সমগ্র জাতিকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে বাংলা ভাষার জন্য মায়া কান্না, আর নিজেদের তথা এলিট শ্রেণির সন্তানদের বিদেশি ভাষা ও ভাবধারায় শিক্ষা দিয়ে অন্যরকম করে গড়ে তোলা এবং দৈনন্দিন চর্চায় সেটারই প্রাধান্য দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। এ অনেকটা ভিন দেশে থেকে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে মাতৃভূমিতে বসবাসের জন্য, মাতৃভাষাকে ভালবাসার জন্য মায়া কান্নার মতো।

সত্যিকারভাবে বাংলা ভাষার পরিচর্যা, বিকাশ বা লালন চাইলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে, নিজ ব্যক্তিজীবনে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও পরিচর্যার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। নিজের ছেলেমেয়ের জন্য যা চাই অন্যের জন্যও তা চাইতে পারার মধ্যেই মহত্ত্ব। আর তা যদি না পারি, যতই বক্তৃতা বিবৃতি দেই না কেন তার অসারত্ব সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। হয়ত মুখের উপর নির্লজ্জভাবে বলতে পারে না যে "তুমি অসততা করছো"। কারণ, সাধারণ মানুষ এখনও ভদ্রতা ধারণ করে। আর এ জন্যই একটি 'সিএনজি' চালিত অটোরিকশার পিছনে একটি বাক্য দেখলাম, "সাধু সেজোনা, সাধু হও"। বলা বাহুল্য, অতি সাধারণ মানুষরাই তা লিখেছে, আর তা লিখেছে দেশের এলিটদের উদ্দেশ্যেই।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

মো. আব্দুল আজিজ মুন্সী

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা

আমাদের দেশে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। 'বাংলা' বাংলাদেশের প্রধান ভাষা এবং আমাদের মাতৃভাষা। দেশের প্রায় ৯৮% মানুষের মাতৃভাষা হলো বাংলা। বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী, এই ভাষাটি তারা মাতাপিতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে ছোটবেলায় শিখেছে এবং ভাষাটি প্রত্যন্ত এলাকায় বহুল প্রচলিত ও এই ভাষায় কথা বলতে সকলেই খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রায় ২০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ভাষাভাষীর সংখ্যানুসারে বাংলা ভাষার অবস্থান চতুর্থ থেকে সপ্তমের মধ্যে। ভারতীয় সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত সেদেশে ২৩টি সরকারি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা, আসাম রাজ্যের কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে স্বীকৃত সরকারি ভাষা হলো বাংলা।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ইতিহাস অনেক পুরানো। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। কোনো কোনো ভাষাবিদের মতে ৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলার জন্ম। (তথ্যসূত্রঃ বাংলাভাষা- উইকিপিডিয়া)। তবে এই ভাষাটি সুস্থির রূপ ধারণ করেছে অনেক দিন পরে এবং দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে। বস্তত বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগে। ১৯৪০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মানভূম জেলাতেই বাংলা ভাষার সপক্ষে (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা) আন্দোলন সংগঠিত হয়। মানভূম জেলায় বসবাসকারী বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে জোর করে হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলে তারা বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করে।

বাংলা ভাষার জন্য ত্যাগের ইতিহাস আমাদের আরও অধিক ও গৌরবময়। ইতিহাসে আমাদের কোনোদিন নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না, আমরা কোনোদিন স্বাধীন ছিলাম না। যদিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই আমাদের মায়ের ভাষা এই 'বাংলা' অঞ্চলের অধিবাসীদের হিসেবে আমাদের একটি নিজস্ব পরিচয় বহন করতো। কিন্তু অ, আ, ক, খ আমাদের বাংলা অক্ষরগুলোকে পিষে মেরে আরবী হরফে বাংলা বা রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তনের জন্য চলেছিল নানা রকমের চক্রান্ত। কিন্তু আমাদের দেশের ভাষাসংগ্রামীগণ অনেক ত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে বাংলাভাষাকে বাংলাদেশ এবং সমগ্র বিশ্বে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনপণ বাজি রেখে বাঙালি উদ্যোগী হয়েছিল। দেশের ভাষাসংগ্রামী তথা বাঙালী জাতি সকল চক্রান্তের জাল একে একে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বাংলা অক্ষরের ফুলমালা সাজিয়ে দিয়েছে। দেশের আনাচে কানাচে আজ ছেয়ে আছে ফুলের মত বাংলা অক্ষর অ, আ, ক, খ---। সে জন্য অবশ্য অনেক সময় লেগেছে। উনিশ শ' আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে বাহান্ন সাল পর্যন্ত ছিল সেই ভাষা আন্দোলনের নিরন্তর পথ চলা। ১৯৪৭ সালের জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশসহ প্রচারমাধ্যম ও বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উর্দু ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। তখন থেকে এর বিরোধিতা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষাবধি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রথম সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। (সংবিধানে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়)। ভাষার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী চেতনা আমাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বপ্ন দেখায়। চূড়ান্ত পরিণতিতে আমরা পেয়েছি লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমরা অনেক ভাষাসৈনিক হারিয়েছি। নিশ্চয় তাঁরা বাংলা ভাষার জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতেন- আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কাজেই ভাষার জন্য বড় একটা ক্ষতি তো হয়েছেই, তবে সেটা পূরণ হতে পারে যদি আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও যত্নশীল হতে পারি। বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিকে সত্যিকার অর্থেই বুকে লালন করেছেন এদেশের মানুষ। অধ্যাপক আবুল কাশেম, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাওলানা আকরাম খান, মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী,

আব্দুস সালাম, আবুল বরকত এবং আরও অনেকে আজ স্মরণীয় হয়ে আছেন। ৮/৯ বছরের কিশোর অহিউল্লাহ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন (তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা- উইকিপিডিয়া)।

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ, যেখানে সকল মানুষ তাদের মায়ের মুখের ভাষায় ভাববিনিময় করে। আজ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট। বিশ্বের কোন জাতির ইতিহাসে বাঙালিদের মত মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের দাবিতে বুকের রক্ত ঢেলে দেয়ার ঘটনা বা ইতিহাস নেই। এই গৌরবময় অর্জন বাঙালি জাতির। আজ সারা বিশ্ব বাঙালির এই অর্জনকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ১৯৫৩ সাল থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবসটি আরও গুরুত্ব সহকারে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয়। দিনটা কখনও জাতীয় শোক দিবস, কখনো বা জাতীয় শহীদ দিবস হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল।

২০০০ সালে ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে যা বৈশ্বিক পর্যায়ে সাম্বাৎসরিভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্ব ২১শে ফেব্রুয়ারিকে নানা আয়োজন, নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে' পালন করে থাকে। মহাকাশেও বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়েছে বলে জানা যায়। মঙ্গল গ্রহে ২০০৪ সালে প্রেরিত রোভারে (স্পিরিট ও অপরচুনিটি) বাংলায় 'মংগল' লেখা রয়েছে। (সূত্রঃ কারেন্ট সাধারণ জ্ঞান অ্যালবাম, পৃষ্ঠা ২৯৬)। এই গৌরবময় অর্জন আজ বিশ্বের প্রতিটি জাতির, প্রতিটি ভাষার, প্রতিটি মায়ের, প্রতিটি শিশুর। আজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। (*প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি ২০১৩)।

প্রতি বছরই দিবসটি পালিত হবে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। আমাদের বাংলাভাষার জন্য ভাষা সংগ্রামীদের মহান ত্যাগের ৬২তম বছর (২০১৪ সাল) উদ্‌যাপিত হবে। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মাতৃভাষা নিয়ে অনেক লেখালেখি এবং আলোচনা হয়। তারপর আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের বাংলা ভাষা কিভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে অন্যভাষার বর্ণমালার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় দেশের আনাচে কানাচে। অফিস আদালত, দোকানপাট, বাড়িঘর, রাস্তঘাট সকল স্থানে বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে ইংরেজি অথবা অন্য ভাষার প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরের বাহিরে বের হলেই চোখে পড়ে নানা রং বেরংয়ের বিদেশী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড বা খোদাই করে লেখা বাড়ি/রাস্তা ইত্যাদির নাম। ছোট ছোট শহরে বা রাস্তার দু'পাশে এমনকি বড় বড় বাজারের প্রায় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং দোকানের নাম দেয়া হয়েছে ইংরেজিতে এবং লেখা হয়েছে বাংলা উচ্চারণে। যেমনঃ ট্রেডার্স, জুয়েলার্স, সুজ, স্টোর, ইলেকট্রনিক্স, টেইলার্স, ক্লথ স্টোর, জুয়েলারি শপ, বুক স্টল, পেপার হাউস, লাইব্রেরী, টি স্টল, স্টেশনারি স্টোর, কটন মিল, হেয়ার কাটিং, হেয়ার ফ্যাশন, ফ্যাশন হাউস, এনার্জি ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট বাজারের বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। একটু যত্ন নিলেই এসব নামের জন্য ইংরেজির বিকল্পে সুন্দর বাংলা শব্দ ব্যবহার করা যেত। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার জন্য আমরা তা করিনি। নামগুলো দেখে মনে হয় ইংরেজী শেখানো হচ্ছে বাংলা উচ্চারণে। ছোট বেলায় আমরা ইংরেজী নোট বইতে এমন অনুবাদ দেখতাম। যানবাহনের নামের ক্ষেত্রে একই রকম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যেমনঃ ট্রেন, ট্রাভেল, ড্রাইভার বলা হয়ে থাকে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম যতগুলো লেখা তার পূর্বে মেসার্স মাঝখানে শুধু নাম তারপর ইংরেজী শব্দ ট্রেডার্স লেখা।

আমরা এখন রাস্তা না বলে রোড বলি, রাস্তার সংখ্যা না লিখে রোড নং লিখে রাখি। অনুরূপভাবে স্টেশন রোড, বাস স্ট্যান্ড, রিক্সা স্ট্যান্ড, মেইন রোড, মেইন পয়েন্ট ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করছি। তেলের কারখানা না বলে অয়েল মিল বলি, সমিতি না বলে ক্লাব বলি, দোকান না বলে শপ বা স্টোর বলি , থালা না বলে প্লেট বলি, পাট কারখানা না বলে জুট মিল বলি, কটন মিল, গ্লাস হাউস ইত্যাদি বলে থাকি এবং লিখে থাকি। পরামর্শ না লিখে 'সাজেশন' লেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি না বলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি বলতে আমরা বেশী গর্ব বোধ করি। মা ডাকের মধ্যে যে সৌন্দর্য- যে প্রাণের আকুলতা, তাও আজ হারিয়ে যাচ্ছে- মম, মাম শব্দের ভেতর। চাচা-চাচি, খালা-খালু, দাদা-দাদি, নানা-নানী ইত্যাদি উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শহর থেকে অনেক পূর্বেই উঠে গেছে। শহরাঞ্চলে চাচা বলা হয় কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য করে। দামী জামা-কাপড় পরা কোন ব্যক্তিকে কেউ চাচা-কাকা বলে না। তারা হয়ে যায় আংকেল। চাচি, খালা, মামী হয়ে যায়-আন্টি। (ব্যতিক্রম থাকতে পারে)। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংরেজী- বাংলা- অন্য ভাষার ব্যবহার একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা। ৫ম শ্রেণীর বাংলা বইতে হিমালয়ের উচ্চতা ২৯,০৩৫ মিটার লেখা আছে। আমাদের শিশুরা এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠছে। ৩/৪ বছরের এক শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার ভাই কোথায়? উত্তর দেয়- বাইয়া-ফেক্সিনোট করতে গ্যাছে, মেইন ওডে (ভাই, মোবাইল ফোনে টাকা ভরতে প্রধান সড়কে গিয়েছে)।

ছোট বেলা থেকে শিশুদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও শুদ্ধ উচ্চারণসহ বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এইখানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা যায়। বিশেষ করে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নামের 'কোচিং সেন্টার'। অভিভাবকগণ আজ কোচিং সেন্টারের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছে। ছোট-বড় শহরের কোনো কোনো আবাসিক এলাকার প্রায় ২০% বাড়ি মনে হয় আজ 'কোচিং সেন্টার' বা বিভিন্ন নামে 'কিন্ডারগার্টেন' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল এলাকার বড় গলির রাস্তাগুলো ব্যানার বিজ্ঞাপনে ভরে থাকে। প্রায়ই বছরের শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে নানা রকমের বিজ্ঞাপন/ব্যানারের জন্য জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরে পড়ে নানা ব্যানারের ছায়া মেঝে আর দেয়ালে এঁকে দেয় জাফরিকাটা নকশা। এসকল ব্যানার বা বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার কমই দেখা যায়।

সমস্ত রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল কার্যালয়ের নামের লেখাগুলো যদি আমাদের মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষায় (বাংলা নাম) লেখা থাকত তবে অনেক শিশু এখান থেকে শুদ্ধ মাতৃভাষা শিখতে পারত। এগুলো মাতৃভাষা বিকাশের বড় মাধ্যম হত। শিশু শিখন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে শিশুরা বিভিন্ন মাধ্যমে শেখে। মাতৃভাষার বা মাতৃভাষা উচ্চারণের মাধ্যমে শেখা সহজ হয়। অল্প লেখা পড়া জানা বয়স্ক ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারতেন। 'পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। মাতৃভাষা- রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।' এই আত্মসমালোচনার বাণী মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের- যা থেকে জানা যায় যে মানব জীবনে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ'। মাতৃভাষা প্রাণ ও মনকে দেয় তৃপ্তি আর চিন্তা চেতনাকে দেয় দীপ্তি। অনেক কথা বলা হয় শিক্ষা নিয়ে কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কিভাবে জাতি গঠনে সহায়ক হতে পারে যে বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগের তেমন খোঁজ পাওয়া যায় না।

ড. কুদরাত-এ-খুদা 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪ সাল)-এর ৪ অধ্যায়ে 'শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান' অংশে বাংলা ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেশের চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। দেশের সকল কার্যালয়-আদালতের যাবতীয় কাজ কর্ম বাংলা সাধুভাষায় ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। (২৭.১১.১৯৭৯ তারিখে সচিব কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে সকল কার্যালয়-আদালতের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা সাধুভাষায় সম্পন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে)। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এক নির্দেশ বলে আন্তর্জাতিক প্রয়োজন ছাড়া সকল অফিস কার্যক্রম বাংলা ভাষায় করার নির্দেশ জারি করেন। তখন সর্বস্তরে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু হয়েছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারি অফিস- আদালতে নির্দেশাবলী দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা উপযোগী পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় রচনা ও অনুবাদের জন্যে পরিভাষাও রচিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। আজ বাংলা ভাষার বর্ণগুলো আস্তে আস্তে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্তরীণ হতে চলেছে। আমাদের ভাষাকে আরও গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। নিজস্ব বর্ণমালা অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিয়ে তার নিচে বা পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে অন্য ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। 'শিহাটা পোস্ট অফিস' না লিখে শিহাটা ডাকঘর লেখা যেত, মেডিকেল হল না লিখে অষুধের দোকান লেখা যেত। বাসা ভাড়া দেয়া হবে, বাড়ি ভাড়া, শিক্ষক দিচ্ছি, বাসায় গিয়ে পড়াই, যত্নসহকারে পড়ানো হয়, শিশু চিকিৎসক ইত্যাদি শুনতে বা বলতে কিনা মজা লাগে। যদি ইংরেজী লেখার দরকার হয় তবে বাংলায় লেখার পরে বা নিচে Shihata Post Office লেখা যেত। কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য সুন্দরভাবে ভাষার ব্যবহার করেছে। যেমনঃ পিঠা মেলা, MUNSUR STORE, কষ্টের টাকায় শ্রেষ্ঠ বাজার- স্বপ্ন Shawpno, শিক্ষা নয় পণ্য-শিক্ষা সবার জন্য ইত্যাদি। এখানে কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো মাত্র। আজ আমরা এত পেছনে চলে এলাম যে, চোপায়া, কেদারার মত অনেক কিছুর বাংলা নাম ভুলতে বসেছি- চোপায়া, কেদারা বললে আজ বুঝানো খুবই জটিল। ইংরেজি ব্যবহার বা ইংরেজি- বাংলার মিশ্রণ নিশ্চয়ই অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু অন্যদিকে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সংকীর্ণতার দিকটিও উপেক্ষা করার মত নয়।

সেজন্য এ বিষয়ে একটি নীতিমালা করে বাংলা ভাষার বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি সাঁওতাল, চাকমা, মারমা ও মগসহ সকল সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে সত্যিকার অর্থেই বুকে লালন করা যায়। আমাদের শিশুরা যতই ইংরেজি বা বিদেশী ভাষা শিখুক না কেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি না শিখলে তারা একদিন আমাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

মো. আব্দুল আজিজ মুন্সী
উন্নয়নকর্মী

মোহাম্মদ হারুন মিয়া

বইও পরিবর্তন আনতে পারে

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত যা ঘটে তা কোনো না কোনো কিছুকে প্রভাবিত করেই। বই কি কোনো কিছুকে প্রভাবিত করে? বদলে দেয়? দিতে পারে? পৃথিবীতে যখনই কিছু ভালো বই রচিত এবং প্রকাশিত হয় তখনই পৃথিবী বদলে যায় নিঃসন্দেহে। বইটি প্রকাশিথ হবার আগে পৃথিবী যেমন ছিলো তেমনটি আর থাকে না।

বই পৃথিবীতে আসে আর প্রভাবিত করে লেখকদের জীবন, সাধারণ মানুষের জীবন, মানুষের পুরো জীবনব্যবস্থা। ভালো-মন্দ মিলিয়েই সে পরিবর্তন। বদলে যায় পাঠকের জীবনও।

যদিও পাঠককে বদলে দেয়া বেশ কঠিন। বেশির ভাগ সময়ই আমরা বই পড়া শেষ করে তা একপাশে সরিয়ে রাখি। বই পড়তে ভালো না লাগলে সেটি যাতে চোখের সামনে না পড়ে তাই আড়াল করে রাখি। পড়ার পর বইটি সরিয়ে রাখলেও কখনো মাথার মধ্যে কিছু সময় তা ঘুরপাক খায়। আর ঘুরপাক খেতে খেতেই তা হয়তো জীবনকে কিছুটা বদলে দিয়ে যায়।

বই পড়ার পর সেটি পাঠকের পছন্দ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে তথ্য সন্নিবেশিত একটি বই যে আঙ্গিকেই রচিত হোক না কেন, পাঠকের প্রয়োজন পড়বেই। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে না হলেও প্রয়োজনের তাগিদে সেটি মানুষ পড়বে। পড়ার পর তিনি বইটির প্রশংসা করতে পারেন। বইটির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান দেখাতে পারেন। বইটির বিষয়বস্তু তার জীবনে হয়তো সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। তবুও বই বই-ই। তার তুলনা হয় না। বইয়ের তুলনা একমাত্র বই।

আসল বিষয় হলো ভালোবাসা। বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। যখন একজন পাঠক একটি বইয়ের প্রেমে পড়েন তখন এটি তার ভেতরে নির্যাস ছড়িয়ে দেয়। আমরা আমাদের জীবনে কিছু বই ভালোবাসি। আমরা আমাদের জীবনকে কিভাবে দেখবো, কিভাবে পরিচালিত করবো এই বই সে পথ দেখিয়ে দেয়। আমরা আমাদের জীবনেকে পড়ে ফেলতে চাই এই বইয়ের মাধ্যমে। সেগুলোর ভেতরের ও বাইরের পৃথিবীর বর্ণনা আমাদের জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, সে বই হয়ে যায় একান্তই আমাদের। একমাত্র ভালোবাসাই এটি করতে পারে, ঘৃণা নয়। কিন্তু বইয়ের কাজ হলো ভালোবাসা আর ঘৃণা দুটোকেই উসকে দেয়া। এ উসকে দেয়াই বইয়ের সেই সামর্থ্যের কথা জানিয়ে দেয় যা ভালোবাসাকে ঘৃণা আর ঘৃণাকে ভালোবাসায় পরিবর্তন করতে পারে।

বই পৃথিবীর নামধাম সবই বদলে দিতে পারে। সৃষ্টি করতে পারে নতুন কিছুর। পারে মানুষের জীবনকেও বদলে দিতে। একটি বিখ্যাত বই মানুষ, সমাজ দেশ, জাতি, গোষ্ঠী এমনকি রাষ্ট্রের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা, কৃষ্টি এক কথায় আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। ইতিহাসকে বিকৃত করতে পারে। ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। বইয়ের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে সব কিছু। যে বস্তুটি জন্মের পর থেকে আজীবন শুধু দিয়েই গেল। বিনিময়ে কিছুই চাইলো না। উৎসর্গ করলো নিজেকে, জানতে সাহায্য করলো পৃথিবীকে, পৃথিবীর অপার রহস্যকে, পরিচয় করিয়ে দিলো পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে। এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিক বন্ধু পৃথিবীতে আর কে হতে পারে? এতো কিছু পরও আমরা তার যত্ন নেই না। বইয়ের কদর করি না, আদর করি না।

এই অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে, অতি ব্যবহারে জীর্ণ তথ্যপ্রবাহের যুগে সাহিত্য এখনো মানুষের জন্য নতুন সংবাদ বয়ে আনতে পারে। বয়ে আনতে পারে হৃদয় ও মনের খবর। নতুন নতুন

খবর যা মানুষকে আনন্দ দেয় প্রতিনিয়ত, পরিচিত করে নতুন নতুন তথ্য উপাত্তের সাথে। সুযোগ করে দেয় নতুন কিছু উপভোগ করার কৌশল।

পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান চিরকালই তথ্যের রূপান্তরের মধ্য দিয়েই সমৃদ্ধ হয়। একজন পাঠক যখন তা পড়ে ফেলেন তখন সেটি সত্যে পূর্ণতা পায়। প্রতিটি পাঠকের মনোজগতে বইয়ের সত্যটি ঠিক একইভাবে ধরা দেয় না। অচেনা, অজানা মানুষের মধ্যে এক অদৃশ্য অথচ কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করে দেয় বই। পাঠকের কল্পনা জগতের এই ছোট বিপ্লবগুলোই তো সাহিত্যেও প্রকৃত বিপ্লব।

একজন লেখক সব সময় নিশ্চিত করে জানতে পারেন না তার লেখা সবকিছুকে কতোটুকু প্রভাবিত করবে। ভালো বইয়ের প্রভাব থাকবেই, আর কিছু কিছু প্রভাব খুবই শক্তিশালী যার কারণেই ঘটে বড় বড় পরিবর্তন। ফুলে ফলে বিকশিত হয় মানুষের জীবনব্যবস্থা। যা মানুষ বইয়ের মাধ্যমেই জানতে পারে।

জন্মের পর থেকে মানুষ তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ও চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিক জগতকে অগ্রগতির দিকে টেনে নিচ্ছে। এই অগ্রগতির আর একটি গূঢ় কথা হলো জ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষকে পড়তে হয়। পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ বিশাল জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করছে। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন- চোখ বাড়াবার পন্থা কি? প্রথমত বই পড়া এবং তার জন্য দরকার বই পড়ার প্রবৃত্তি। পুস্তক মানুষের জীবন জগৎ এবং মনোরাজ্যের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে রেখেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- 'বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে'।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন - জ্ঞানের থেকেও বড় হচ্ছে কল্পনাশক্তি। তাই ছাত্রছাত্রীদের কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির জন্য সৃজনশীলতা সৃষ্টির জন্য, জানা-অজানার পৃথিবীকে জানার জন্য প্রচুর বই পড়া প্রয়োজন। বই শুধু ব্যক্তিকেই জ্ঞান দেয় না, বরং একটি জাতির সংস্কৃতিকে যুগের পর যুগ ধরে রাখে, লালন করে। বই জ্ঞানের প্রতীক, আত্ম-বিশ্বাসের প্রতীক, আত্ম-সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই এই প্রত্যয়ের সাথে পরিচিত হতে বেশি সবারই বেশি বই পড়া প্রয়োজন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য চাই প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস। যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাণ্ডারও শূন্য। বই যেমন আপনাকে আনন্দ দেবে, তেমনি জ্ঞানও দান করবে। বই পড়ার অভ্যাস গড়ার জন্য আপনার সীমাহীন আগ্রহ, একাগ্রচিত্ত ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। মনন, শক্তি ও হৃদয় বৃত্তিকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করার মাধ্যমেই পুস্তক পাঠের দ্বারা ব্যক্তির উন্নয়ন অনস্বীকার্য। মানুষ যতই পুস্তক পাঠ করবে তার মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া ততো দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং জ্ঞানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি চিরদিনের। নিত্য নতুন জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল, দুর্গম পথ, অপার সমুদ্র এবং মহাশূন্যেও বিচরণ করে চলেছে। তাঁরা অর্জন করেছে নিত্যনতুন জ্ঞান। জ্ঞানী-গুণী-মনীষী ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার ও সুখ-দুঃখকে বইয়ের পাতায় সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য মূল্যবান পথ প্রদর্শক হিসেবে রেখে গেছেন। মহাকালের স্রোতোধারায় অজস্র জ্ঞানপিপাসু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা জ্ঞানের সুধার সন্ধান পেয়ে সেই ভাণ্ডারে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্দ্বিধায়। তাঁদের মত এই মহাকালের স্রোতোধারায় জ্ঞানীর সন্ধানী হতে হলে জানা-অজানার পৃথিবীকে জানতে হলে পুস্তক পাঠের মাধ্যমে আপনাকে মগজ ধোলাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অতীত ঐতিহ্য, নানা চিন্তার অনুশীলন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজানা রহস্য ও বিচিত্র ভাবধারার সহজাত প্রবৃত্তি আপনার মনে যে কৌতূহলের জন্ম দেবে, তা আপনার মেধা বিকাশের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এ কৌতূহলই আপনার মনে সীমাহীন আগ্রহের সৃষ্টি করবে, নিয়ে যাবে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের স্রোতোধারায়। সে ধারাই আপনাকে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশে সাহায্য করবে।

বই-ই মানব জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। একটি ভালো বই আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। বই থেকে অর্জিত জ্ঞান কখনো হারিয়ে যায় না, খোয়া যায় না। ইচ্ছে করলেও তা হৃদয়-মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। তাই জীবনকে গড়তে হলে, প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, ক্যারিয়ার উন্নত করতে হলে কিশোর-যুবক, তরুণ-তরুণী, ছাত্র, শিক্ষক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিরিয়ার সবাইকে প্রচুর বই পড়তে হবে এবং জ্ঞান রপ্ত করতে হবে। কেননা অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় ব্যতীত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই উঁচু মানের বই-পুস্তকের আশ্রয় নিতে হবে। আত্ম উন্নয়নমূলক রচনা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, রাজনীতি, শিক্ষা ও উন্নয়ন, চলমান ঘটনা, সংবাদপত্র এবং সাময়িকীসহ মিডিয়া স্টাডি আপনার ব্রেইন ওয়াশের প্রক্রিয়া। যা আপনার মেধাকে শাণিত করে সহজেই কোনো কিছু আয়ত্ত করার ক্ষমতা যোগাবে।

সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বিকাশের জন্য জ্ঞান চর্চার কোনো বিকল্প নেই। আর জ্ঞান চর্চার উৎস হচ্ছে বই। আমরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যেসব বই পড়ে থাকি, সেগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলোর বাইরে আমাদের আরও অনেক বিষয় জানার আছে। পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান, মহাজ্ঞানীদের জীবনী, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোথায় কী ঘটছে? বিশ্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি পরিচিতি, সভ্যতার উত্থান-পতন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদেরকে নানান ধরনের পুস্তকের শরণাপন্ন হতে হবে। তাহলেই আমরা সৃজনশীলতার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে। মেধাবিকাশের সাথে সাথে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকবে। এ আগ্রহই বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা এবং মানসিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। এখান থেকেই বেরিয়ে আসবে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বিকাশের পথ। মানুষের মাঝে রয়েছে এক অবচেতন বৃত্তি। এ অবচেতন বৃত্তিরই গভীরে লুকিয়ে আছে অসীম চেতনা শক্তি। প্রতিটি মানুষই এ শক্তির একজন আবিষ্কারক। মানুষ মহান স্রষ্টার এক অসাধারণ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হল আশরাফুল মাখলুকাত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে কাজ করেছে মানুষের ভেতরের সীমাহীন জিজ্ঞাসা, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অসীম কর্মদক্ষতা। জ্ঞানপিপাসু মানুষগুলো মর্ম থেকে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সাথে ভেবেছে মহাশূন্যের কথা, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের কথা।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের কথা আমরা সবাই জানি। যার একটি বাণী Know Theyself অর্থাৎ নিজেকে জানো। যুগ যুগ ধরে তা মানব মনের ভেতরে আত্ম-জিজ্ঞাসার খোরাক যোগান দিচ্ছে। নিজেকে জানার মাঝেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায় ও সৃষ্টিকে জানা যায়। উন্নত জীবনের জন্য বই কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা শুধু আলোচনার বিষয়ই নয় বরং গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনুষ্য জাতির আদি এবং সর্বকালের সাক্ষী এই বই।

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম হোতা ভিক্টোর হুগো বহু পূর্বে বলেছিলেন- উন্নত জীবনের জন্য বই, সমৃদ্ধির জন্য বই। এই স্লোগান প্রমাণ করে যে, বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানব সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য জ্ঞানদান করে। অতএব বই হচ্ছে সভ্যতার রক্ষাকবচ।

সভ্যতা গড়ে উঠে, আবার কালের বিবর্তনে ধ্বংসও হয় এমন বহু নজির রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার কোনোটাই আজ অক্ষত নেই কিন্তু প্রাচীন কালের যে বইটি রক্ষা পেয়েছে, তা অক্ষত অবস্থায় অতীতের বার্তা বহন করে আজও চলছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। এমন কি কোনো প্রাচীন ভাষার প্রবাহ শুকিয়ে গেলেও বইয়ের কদর ম্লান হয়ে যায়নি।

গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃতি ভাষা কবেই মরে গেছে কিন্তু ঐসব ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি যুগ যুগ ধরে মানুষকে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণ করে আসছে। ভবিষ্যতেও করবে। বই জীবনভর শুধু মানুষকে, মানব জাতিকে দিয়েই গেছে, বিনিময়ে সে কিছু নেয়নি। বই কখনো নিতে জানে না। প্রতিদানের আশা রেখে সে কিছু করে না, অতীতেও করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। এদিক থেকে বই অমরত্বের অধিকারী। বই না পড়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। জ্ঞানের কথাগুলো, পৃথিবীর জানা-অজানার অতীতগুলো পুস্তকের পাতায় মুক্তদানার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলোকে রপ্ত করতে বইয়ের সাহায্যের কোনো বিকল্প নেই। বই নিজেকে চেনায়, জ্ঞানীকে চেনায়, জ্ঞান ভাণ্ডারের জগতে প্রবেশ করায় এবং পরিশেষে জ্ঞানী হতে সাহায্য করে।

জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল হেরা পর্বতের গুহায়- "পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" বাণীতে আবদ্ধ হয়েছে। এই মহৎ অনন্য বাক্য মানুষের চেতনায় প্রথম যে আগ্রহ নতুন করে রোপণ করেছিল তা হতে অঙ্কুরিত আজকের মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জ্ঞানময় বৃক্ষের।

বই ব্যতীত যেমন জ্ঞানের পরিচয় মেলে না, তেমনি জ্ঞানীর সন্ধানও মেলে না। কথাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফার্সী ভাষার বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন,

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A glass of wine, a book of
verse and thou-
Beside me singing in the wilderness-
And wilderness is paradise now.

অর্থাৎ - সেই নিরালা পাতায় সেরা বনের ধারে শীতল ছায়া খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।

পরিশেষে বলতে পারি- বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। বই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত করে। অন্ধজনকে আলোকবর্তিকা দান করে। বই মানুষকে পৌঁছে দেয় জীবনের স্বর্ণ শিখরে। বই মানুষের জীবন, পৃথিবী, সমাজ, দেশ, বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতি, শিক্ষিত, পণ্ডিত, শিক্ষক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষকে, মানুষের জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বই পৃথিবীর পট পরিবর্তন করে অশান্তি দূর করে সেখানে শান্তি আনয়ন করতে পারে। তাই বইয়ের কোনো তুলনা হয় না। বইয়ের তুলনা একমাত্র বই।

মোহাম্মদ হারুন মিয়া
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

পরীক্ষার্থী বাড়লেও ঝরে গেছে পৌনে দুই লাখ

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ রোববার। এ তিন পরীক্ষায় নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ৩২ হাজার ৭২৭। গতবারের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ২৯ হাজার ৫৫৪ জন। তবে এ তিন পরীক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে নিবন্ধন করেও এক লাখ ৬৬ হাজার ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। দুই বছর আগে নিয়মিত শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। দুই বছর আগে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধন করেছিল ১৪ লাখ ৪২ হাজার ৬ জন। এর মধ্য থেকে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে ১২ লাখ ৭৫ হাজার ১৫৯ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী।

গতকাল শনিবার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল ও কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ তিন পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এসএসসিতে ১০ লাখ ৯০ হাজার ৫৫৫, দাখিলে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৪৯ এবং এসএসসি ভোকেশনালে ১ লাখ ২ হাজার ৪২৩ ছাত্রছাত্রী। মন্ত্রী জানান, এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকেরাও মুঠোফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। কেবল কেন্দ্রসচিব মুঠোফোন ব্যবহার করতে পারবেন। এবার পাঁচটি বিষয় বাদে বাকি ২১টি বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে। বাদ থাকা পাঁচটি বিষয় হচ্ছে গণিত, উচ্চতর গণিত, বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা খাতুন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম মিয়া, কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম প্রমুখ।

প্রথম আলো ৯.০২.২০১৪

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ৬০ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ শুরু

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উদ্দেশ্যে সরকার ৬০ হাজার শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। এতে সরকারের ব্যয় হবে ৭৫ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'টিচার্স কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই)' প্রকল্পের অধীনে দেশের ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ২ হাজার শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ-টু-আই প্রোগ্রামের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব এনআই খান উদ্ভাবিত 'টিচার্স লেড ডিজিটাল কনটেন্ট' পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষকদের ১৪ দিনব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে এই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এই শিক্ষকরা এরই মধ্যে চালু হওয়া দেশের ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন। এ প্রসঙ্গে টিচার্স লেড ডিজিটাল কনটেন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব এনআই খান বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ভালো কনটেন্ট তৈরি একটি অপরিহার্য বিষয়। উন্নত মানের কনটেন্ট তৈরি এবং তা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিনা খরচেই শিক্ষকরা যেমন কনটেন্ট তৈরির জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন, তেমনি 'শিক্ষক বাতায়ন ওয়েবপোর্টাল-এর মাধ্যমে বিনা খরচেই ভালো কনটেন্ট দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। টিকিউআই প্রকল্প পরিচালক বনমালী ভৌমিক বলেন, সরকার সর্বত্র মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুর লক্ষ্যে শিক্ষকদের কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের ১৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে আমরা শিক্ষকদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছি। পর্যায়ক্রমে ৬০ হাজার শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে সরকারের ব্যয় হবে ৭৫ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর দীপক কুমার নাগ বলেন, বাংলা, ইংরেজি, কৃষি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিমূর্ত অধ্যায়গুলো ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে মূর্ত করে তুলে ধরার জন্যই শিক্ষকদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আলোকিত বাংলাদেশ ৯.০২.২০১৪

ঝরে পড়াদের সুযোগ দিতে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবোর্ড

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে উপা-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড, গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশের যেসব বয়স্ক লোক ১৪ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পায়নি তারা এই বোর্ডের অধীনে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে পারবেন। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'উপা-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪'র খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয়। তবে আইনের এই খসড়াটিতে মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রস্তাব সন্নিবেশিত করে পুনরায় তা উত্থাপনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, সরকার প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করছে। ঝরে পড়া ও অন্যান্য কারণে বিপুলসংখ্যক শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে। সরকার তাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্যও রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়ে কোন আইন নেই। তিনি বলেন, আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আইনের খসড়াটি আবারো মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক ২.০২.২০১৪

সাক্ষরতার আওতায় আসছে আরও ৪৫ লাখ মানুষ

দেশে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর মানুষ প্রায় সাড়ে তিন কোটি। তাদের মধ্যে ৪৫ লাখ মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নেয়া হয়েছে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় আসবে ৬৪ জেলার ২৫০ উপজেলার নারী ও পুরুষ। মঙ্গলবার প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (একনেক)। রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেকের বৈঠকে এ প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের আওতায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা দেয়া হবে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৫৩ কোটি টাকা। মেয়াদকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (এনএফই) ম্যাপিং রিপোর্ট-২০০৯ অনুসারে দেশে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনার সুযোগ নেই। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ দেয়া সম্ভব। এ লক্ষ্যেই প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ ১২.০২.২০১৪

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বইমেলা শুরু

একটি শিখন সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন জীবনব্যাপী শিক্ষা। আর শিক্ষাবিস্তারের জন্য এ দেশের অগ্রগণ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রয়েছে বিচিত্র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুনির্ভর সহজ ভাষায় রচিত উপকরণের এক অনন্য সম্ভার। শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় পাঠাগারগুলোতে এসব উপকরণ পৌঁছে দিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজন করেছে মাসব্যাপী বইমেলার। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে এ বইমেলা। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ধানমণ্ডির ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবারসহ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে এ মেলা। মেলায় প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য বিষয়নির্ভর উপকরণমালার মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, শিশুতোষ, মানবাধিকার, ধর্ম ও জীবন, জীবন-জীবিকা, জীবনী গ্রন্থ, দেশ ও সমাজ, দুর্যোগ মোকাবিলা।

আলোকিত বাংলাদেশ ০১.০২.২০১৪

বই পড়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রত্যয়

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে'- কবিগুরুর এ আহ্বানে কণ্ঠ মিলিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রত্যয়ে শেষ হলো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরস্কার বিতরণ উৎসব। দুই দিনের উৎসব শেষে খুদে পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা বইকে চিরসঙ্গী করার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরল বাড়ি।

গতকাল শনিবার রমনার বটমূলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ঢাকার ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক হাজার ৮৬৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রথম দিন গত শুক্রবার দুই পর্বে পুরস্কার নিয়েছিল আরও ৫২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট তিন হাজার ৮৩৬ জন শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক শরিফ মোঃ মাসুদ স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালের আয়োজনে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী বই পড়েছে, চলতি বছরে তা দ্বিগুণ হবে বলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস। পরিচালক জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে বই পড়ার কর্মসূচি চালু হচ্ছে।

'আমরা বড় হলে বাংলাদেশ বড় হবে'- এই আশাবাদ প্রকাশ করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি বলেন, এক একটি বই এক একটি জানালা। যে যত বেশি বই পড়বে, তার সামনে তত বেশি আলো ঝলমলে জানালা খুলে যাবে।

শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলায় উৎসাহ দেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ। তিনি বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জাতির আলোকযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ার বলেন, পরিবর্তন ও সৃজনশীল মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠার মূল মন্ত্র বই পড়া। তিনি নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচির বাইরে বেশি করে বই পড়ার আহ্বান জানান।

বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই- এ মন্তব্য করে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের জন্য বই পড়া আরও বেশি প্রয়োজন। বই পড়েই নতুন প্রজন্মকে দেশের পরিবর্তন আনতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সত্যের পথে অবিচল থাকার আহ্বান জানান প্রকৌশলী আবদুল আউয়াল। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের সত্যের পথে সিংহের মতো বাঁচতে হবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য দেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দুই ট্রাস্টি মাহবুব জামিল ও শাহ আলম সারোয়ার, টিভি ব্যক্তিত্ব আব্দুন নূর তুষার, বিপিএটিসির রেক্টর কবি শফিক আলম মেহেদী প্রমুখ। মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীনফোন এ অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহযোগিতা করে।

প্রথম আলো ০২.০২.২০১৪

স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ গ্রামীণফোনের

সারাদেশের ২ হাজার ৫শ' মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ২১ লাখ ঘন্টা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে গ্রামীণফোন। গ্রামীণফোন ঘোষিত সবার জন্য ইন্টারনেট কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ ঘোষণা দেয়া হয় বলে জানা গেছে। কর্মসূচিটি চালুর মাধ্যমে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী ইন্টারনেট ব্যবহার ও এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এ কর্মসূচি ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে এই মাস থেকেই শুরু হয়েছে বিনামূল্যের ইন্টারনেট সেবাদান কর্মসূচি। আর এতে সহযোগিতা করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক। সারাদেশে ব্র্যাকের যেসব সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শুধুমাত্র সে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের এ সুযোগ পাবেন। সোমবার ধানমন্ডির আলী হোসেন গার্লস হাইস্কুলে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন গ্রামীণফোন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও টেলিনর গ্রুপের হেড অব এশিয়া সিগভে ব্রেক্কে।

উদ্বোধন কালে সিগভে ব্রেক্কে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, '১৫ বছর বয়সে আমি নরওয়ের একটি গ্রামে ছিলাম। আমার কৃষক অথবা শিক্ষক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইন্টারনেট প্রযুক্তির কারণে আজ আমি বাংলাদেশে ও এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি। জেনে রেখো, ইন্টারনেটের কল্যাণে একদিন তোমরাও নিজেদের গর্ব করার মতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। ইন্টারনেটের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের কাছে ইন্টারনেট দিয়ে কি কি করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না তা জানতে চান সিগভে। এ সময় সিগভে ব্রেক্কে ইন্টানেটের খারাপ দিক থেকে সতর্ক থাকার ওপর জোর দেন। পরে তিনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইন্টারনেট বিষয়ক একটি কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেন।

ব্র্যাকের সিনিয়র ডিরেক্টর আসিফ সালেহ, গ্রামীনফোনের হেড অব কর্পোরেট কমিউনিকেশনস তাহমিদ আজিজুল হক এবং আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাজেদুল আলম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জনকণ্ঠ ১১.০২.২০১৪

পাঠ্য বইতে প্রজনন স্বাস্থ্য জ্ঞান থাকা জরুরি: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পাঠ্য বইতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। ইতিমধ্যে পাঠ্য বইয়ে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামীতেও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এ পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ আয়োজিত 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য : ২০১৩ সালের মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠ্য বইয়ের বিষয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রগতি সংঘের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গবেষণার ফলাফল হস্তান্তর করেন সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর। একই সময় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমানের কাছেও এ ফলাফল হস্তান্তর করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্তমান যুগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।' শিক্ষামন্ত্রী নারী প্রগতি সংঘের এ গবেষণার ফলাফল গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় সভায় গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

কালের কণ্ঠ ১৯.০২.২০১৪

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম

২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি গণসাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিষয়ক এক পরিদর্শন কার্যক্রম।

পরিদর্শন কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংস্থাসমূহের নেতৃত্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিক, স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ প্রায় ২১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মী, শিক্ষক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহের মধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং দেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ।

এ পরিদর্শন কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীগণ ঢাকায় অবস্থিত মট্স, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, পিআরডিএস, বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী জীবন কুমার সরকার উক্ত সেশনটি পরিচালনা করেন।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজন জনঅংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

গত ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ ভোলা সদরের ভেদুরিয়া ও চর সামাইয়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় "প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন" বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন। ওরিয়েন্টেশনে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, পিটিএ সদস্য, স্থানীয় ইউপি শিক্ষা কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ মোট ৬৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন বলেন, ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মনোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোলার সহকারি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলম।

কোর্স পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ভোলার পিটিআই-এর তত্ত্বাবধায়ক শিরীন শবনম, ভোলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল ছাত্তার জমাদার এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান আখন্দ।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ

এডুকেশন ওয়াচ ২০১১-১২-এর সহজবোধ্য বাংলা সংস্করণ-এর খসড়া উপস্থাপন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কামারগাঁও আইডিয়াল হাই স্কুল, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট-এর যৌথ উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ ২০১১-১২ প্রতিবেদনের সহজবোধ্য পাঠ বিষয়ে একটি অবহিত করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল বাতেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-এর সহকারি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এ. কে. এম শাহজাহান। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শফি আহমেদ, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক।

কে. এম. এনামুল হক তার আলোচনায় এডুকেশন ওয়াচ দল গঠনের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য, এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন কিভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রমকে গতিশীল করে ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

শফি আহমেদ এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা প্রতিবেদনের পটভূমি, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি সবার সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি শিক্ষা কর্মকতা, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রভাষকবৃন্দ, সমাজসেবা কর্মকর্তাবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ, ইমাম, অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, অন্যান্য পেশাজীবী এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সহ মোট ১৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক কর্মচারী

ঐক্যজোট-এর মহাসচিব মো. জাহাঙ্গীর খান মতবিনিময় সভার সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন।

সামছুন নাহার বেগম কলি

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষায় সমাপ্তকরণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর দেশের ৪টি জেলায় (খুলনা, গাইবান্ধা, হবিগঞ্জ এবং ভোলা) কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায়

গত ফেব্রুয়ারি মাসে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা সমাপনে সকলের অংশগ্রহণ শিরোনামে এই ক্যাম্পেইনে শিক্ষামেলা, আলোচনা সভা, নাটক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

ক্যাম্পেইনে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ক্যাম্পেইনে প্রায় দুই হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল।

আবেদা সুলতানা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত শিক্ষামেলা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় ৩টি জেলায় 'শিক্ষা

মেলা' আয়োজন করে। ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সহযোগী সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যথাক্রমে মেহেরপুরের আমঝুপি এবং গাইবান্ধার সাঘাটায় তিন দিনব্যাপী এই মেলা আয়োজন করে। এছাড়া ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি জামালপুরে সহযোগী সংগঠন আইজল শিক্ষামেলা আয়োজন করে।

স্থানীয় পর্যায়ে এধরনের মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি ও সবার মধ্যে একুশে চেতনা ও এর তাৎপর্য তুলে ধরা। মেলায় স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের শিক্ষা উপকরণসমূহ প্রদর্শন ও বিস্তরণ করেন। বিভিন্ন সংস্থার সুসজ্জিত স্টল ছাড়াও মেলাও আরো বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ফারদানা আলম সোমা

কেমন বই চাই বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রচারাভিযান কর্মসূচি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্থানীয় সহযোগী সংগঠন রাসিন-এর উদ্যোগে উত্তর চরমাধবদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'কেমন বই চাই' শীর্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে উল্লেখিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

সারাদিনের কার্যক্রম মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথমাংশে অনুষ্ঠিত দলীয় কাজে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর মোট একশ শিক্ষার্থী সরাসরি পাঠ্যবই ও অন্যান্য সহায়ক বই সম্পর্কে তাদের মতামত জানায়। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নয়, বইয়ের ভাষা, প্রচ্ছদ, রঙ, অংকন, বাধাই, ছবির মান ও ছাপার মান এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান কৌশল নিয়েও তারা মতামত দেয়। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয় পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে তাদের মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহের জন্য।

দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের মধ্যদিয়ে প্রাপ্ত মতামতসমূহের সার- সংক্ষেপ উপস্থাপন

করে। অনুষ্ঠানে রিপোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শফি আহমেদ ও প্রধান অতিথি ছিলেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম কর্মকর্তা ফারদানা আলম সোমা।

সাজ্জনা আইউব

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ: শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান সিডিডি'র সহযোগিতায় সাভারে সিডিডি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ 'প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা' আয়োজন করে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় দেশের ৮টি জেলায় চলমান কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এর কর্মএলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৭ জন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

এই কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার প্রাথমিক সনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উপযোগী করা, ব্যবস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ-কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন, একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে শিক্ষকের করণীয়, প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাজ্জনা আইউব

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

- একুশ আমার জাতির প্রতীক
  একুশ আমার পরিচয়।
- একুশ মানে মাথা নত না করা
- একুশ মানে সকল ভাষার চিরায়ু হৃৎস্পন্দন।
- মোদের গরব মোদের আশা
  আ মরি বাংলা ভাষা।
- মাতা পিতামহসহ বঙ্গেতে বসতি।
  দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।
- যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,
  সে জন কাহার জন্ম নির্ণয়ে ন জানি।
- হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব, কত বিবিধ রতন।
- বিনা স্বদেশী ভাষা
  মেটে কি আশা।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ভাষার নিরন্তর উন্নয়ন সাধন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় কাজের সব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার চাই।
- প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধে সবাই সোচ্চার হয়ে উঠুন।
- শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য ও সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৩৭ ফাল্গুন ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা

স ম্পা দ ক

ফেব্রুয়ারি মাসটা নানা কারণেই বাংলাদেশে একটা সর্বজনপ্রিয় সময়। অবশ্যই এই মাসের নামের উচ্চারণটির সময় অনিবার্যভাবে আমাদের সকলের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কথা মুখ্য হয়ে ধরা দেয়। এই মাসেই আবার আমরা ঋতুরাজ বসন্তকে অভিবাদন জানাই। আধুনিক জীবনযাত্রার নানান জটিলতা, ব্যস্ততা এবং অনেকাংশে আত্মমগ্নতায় বসন্ত হয়ত সেই আগের মত করে আমাদের আর রাঙিয়ে দেয়ার অবকাশ পায় না। তবু নাগরিক জীবনের বৃত্তেও উৎসুক ব্যক্তি চাইলে এখনো এই ঢাকায় কোকিলের কুহু কুহু শুনতে পারেন বা একটু চেষ্টা করলে পলাশের রক্তিম আভা দেখতে পারেন। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, পৌষ-মাঘের কিছু বিচ্ছিন্ন দিনগুলির স্বল্পায়ু শীতের প্রকোপ যেতে না যেতেই ইদানীং বাতাসে উষ্ণতার মাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পায়, তাতে বসন্তকে বড়ই ম্রিয়মাণ মনে হয়, যেন সে শুধু কবি-শিল্পী, সাহিত্যিক-গাইয়েদের অলস মায়া। ফেব্রুয়ারি আর বসন্তকে এক সঙ্গে বেঁধে এমন আলোচনায় বর্ষপঞ্জি ও ভূগোলের দিক থেকে বিষমতার অভিযোগ তোলাই যেতে পারে। তবে আমাদের এই অঞ্চলে বসন্ত আবাহনের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে ভ্যালেন্টাইনের ভালোবাসা দিবস উদযাপনের যে কূল-ছাপানো ঢেউ লেগেছে, তাতে ওই দুই দিকপনার মধ্যে একটা অনস্বীকার্য ফাল্গুনী মিতালী রচিত হয়েছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
সৌজন্যে: ইউনেস্কো

এমন হৃদয়ের আবেশ জড়ানো কথা আর ভাবনার বিপরীতে বিশেষত এই বাংলাদেশে, আমাদের জন্য ফেব্রুয়ারির যে আলাদা একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অর্থ আছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেটার দিকেই আমাদের মনোযোগটা বেশি পড়ে। বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন আমাদের কতিপয় টগবগে তরুণ। তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্য করেছিলেন। সুনীতি, সুবিচার ও ন্যায্যতার পক্ষে আজ থেকে বাষট্টি বছর আগের সেই আত্মত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের যে রাজনৈতিক শৃঙ্খলমুক্তি তার সমুখে ও নেপথ্যে জাতির সোচ্চার অথবা অনুক্ত যেসব প্রত্যাশা ছিল, এই ফেব্রুয়ারিতে, এই ফাল্গুনে আমরা সেসবের দিকে তাকিয়ে শুধু স্মৃতিকাতরতায় অভিভূত বোধ করি না, বেদনায় অথবা পরাজয়ে বিপর্যস্ত বোধ করি।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতে শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করা যায়, মাঝে মাঝে তা অসভ্যতা ও সহিংসতায় পর্যবসিত হয়। এতসব বিচিত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং জোটের ব্যানার দেখি, তখন দূরে দাঁড়িয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এরাই সবাই কি বাংলাভাষাকে ভালোবাসে, বাংলাদেশকে ভালোবাসে, এদেশের অতীত গৌরবকে শ্রদ্ধা করে, আত্মত্যাগের অর্থ বোঝে? বাম, দক্ষিণ, মধ্য, বাঙালি, বাংলাদেশী, দক্ষিণ এশীয়, ধর্মনিরপেক্ষ, ইসলামী, মার্কিন, ইউরোপীয়, দূরপ্রাচ্য ইত্যাকার নানান আনুগত্যে ক্রমবর্ধমান বিভক্তিপ্রয়াসী আমাদের সমাজে এই সব বরোয়ারি অভিসন্ধিমূলক মিশেলেও কিন্তু 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'... গাইতে গিয়ে অথবা গলা মেলানোর সময় অন্তঃস্থিত অশ্রুর স্রোত এসে এখনও আমাদের শিহরিত করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org